বিজলী . . . .

—সুশীলপ্রসাদসর্ব্বাধিকারী—

ভারাঙমী

১৩৩৯ কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

শোকার্ত্ত গ্রন্থকারের অসুস্থতা নিবন্ধন "বিজলীর" পাণ্ডুলিপি অনেক দিন পড়িয়া ছিল। ভগবদেচ্ছায় "বিজলী" প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকারের পঞ্চম ও সপ্তম জ্যেষ্ঠাগ্রজ "বিজলী" প্রকাশে নানা ভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

প্রেসের শ্রীমান মাখনলাল, চিন্তাহরণ ও সত্যেন্দ্রের 'বিজলী' মুদ্রাঙ্কনে উৎসাহের সীমা থাকে নাই।

মুদ্রাঙ্কন কালেও গ্রন্থকার অসুস্থ মধ্যে মধ্যে হইয়া পড়ায় স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ থাকিয়া গিয়াছে তজ্জন্য আমি দুঃখিত। পাঠক পাঠিকা অনুগ্রহ করিয়া—

পৃঃ	লাইন	স্থানে	
৩৮		কশাঘাতে ও তাহাকে	কশাঘাতেও
৪৫	৫	পরিয়া	করিয়া
৮৭	১৫	শরণাপন্ন'	শরণাপন্ন
১২৮	১৩	আয়ুবৃদ্ধ্যান্ন	আয়ুরন্ধ্যান্ন
১৪০	২৫	মৃগবতী	মৃগপতি

পাঠ করিবেন। ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ 'গ্রন্থকারের শেষ কথা'য় ১৭ লাইনের পরে "দোষ কাহারও নহে দোষ আমার কপালের" মুদ্রিত হয় নাই। এই পুস্তকে "কি "কী" "কোনো" "কখনো" নাট্যালয় 'নাট্যামোদী'ই ব্যবহৃত হইয়াছে। অলমিতি—

জন্মাষ্টমী

প্রকাশক

প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত। প্রিন্টার—শ্রীমতিলাল মজুমদার।

বিদ্যোদয় প্রেস, ১৬৭।২, কর্ণয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ
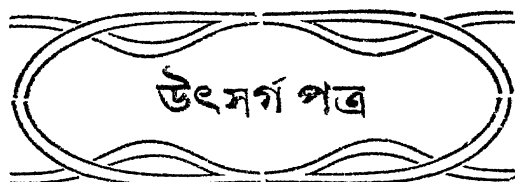
শ্রীশ্রীরাধাকান্ত।

আমার

জীবনের মহারাত্রে 'বিজলী' ছানিয়া

দশদিশি দীপ্ত করি ভাতিলে মহান।

তোমার

সেবা, শান্তি, মধুরিমা আহুতি দানিয়া

মাতৃযাগ প্রতিষ্ঠাতে গেলে নিজস্থান॥

হে 'ভগবান!

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

পরিপূর্ণমস্তু।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

আবির্ভাব—
২৮শে ভাদ্র, ১৩১৭।

তিরোধান—
২৩শে আষাঢ় ১৩৩৭

প্রাগুক্তি

সোদরপ্রতিম শ্রীমান মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী আমার উপর একটা কঠোর ও মর্ম্মান্তিক কাজের ভার দিয়েছেন—এই 'বিজলী' বইখানির একটা প্রাগুক্তি লিখে দিতে হবে।

এই সুদীর্ঘ জীবনে অনেক সাহিত্যিক বন্ধুর অনুরোধে, নিতান্ত অযোগ্য হ'লেও অনেক গ্রন্থের ভূমিকা আমাকে লিখ্‌তে হয়েছে। কিন্তু এই 'বিজলী' বইখানির প্রাগুক্তি লিখ্‌তে আমার কলম চল্‌ছে না—বিজলীর পবিত্র, অলোকসামান্য জীবন-কথা, সেই প্রফুল্ল কুসুমের অকালে শোচনীয় মহাপ্রস্থান আমাকে অভিভূত করেছে। এমন সর্ব্বগুণসম্পন্না, অতুলনীয়া বিজলীর সম্বন্ধে আমি কি বলব,—এই স্মৃতি-গ্রন্থে বিজলীর জীবন-কথা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে; শক্তিশালী লেখক অশ্রুপূর্ণ নয়নে যে সকল কথা বলেছেন, তার চাইতে ভাল ক'রে বলা সম্ভবপর নয়।

বিজলী বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়, মহানুভব, জ্ঞানে-ধর্ম্মে শীর্ষস্থানীয় সর্ব্বাধিকারী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল; স্বনামধন্য ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাহার পিতামহ, সার দেবপ্রসাদ, পরলোকগত সুরেশপ্রসাদ, সাহিত্যিক মুনীন্দ্রপ্রসাদ তাহার পিতৃব্য, মনীষী সুশীলপ্রসাদ তাহার পিতৃদেব। আবার, ও-দিকে খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কেদারনাথদাস মহাশয়

তাহার মাতামহ। এমন শুভসংযোগ কয়টী মেয়ের অদৃষ্টে ঘটে। তাই, সত্যসত্যই বিজলীর মত দীপ্তি নিয়ে বিজলী জন্মগ্রহণ করেছিল। তার পর দুইদিন সংসার রঙ্গমঞ্চে খেলা ক'রে, অপূর্ব্ব শোভা ছড়িয়ে, অননুকরণীয় চরিত্র-মাহাত্ম্য দেখিয়ে যেখান থেকে এসেছিল, সেইখানে চলে গেল—বিজলীর দীপ্তি নিবে গেল,—রেখে গেল দুর্ভাগ্য পিতামাতার, অসংখ্য আত্মীয় স্বজনের জন্য দুর্ভেদ্য অন্ধকার—জীবনব্যাপী হাহাকার!

এই বুঝি বিধাতার কঠোর বিধান। নইলে কুড়ি বছর বয়স পূর্ণ না হতেই বিজলীর মত অলোকসামান্যা মেয়ে কত কাজ অসম্পূর্ণ রেখে, কত সাধ অপূর্ণ রেখে চ'লে যায়! এই কুড়িটা বছরে সে কি শোভা, কি আনন্দ, কি পবিত্রতাই না বিতরণ করেছিল। অতি শীঘ্র চ'লে যেতে হবে ব'লেই বুঝি সে এমন ক'রে খেলা ক'রে গেল। আমার মনে হয়, যে যায় সে বেঁচে যায়, যারা থাকে তারাই হাহাকার ক'রে মরে। এই 'বিজলী' বইখানি সেই হাহাকারের নিদর্শন। আমার বিশ্বাস বাঙলার মেয়েরাও 'বিজলীকে' বুকে ক'রে নিয়ে কাঁদবেন।

আমি আর কি বলুব। এই পবিত্র জীবন-কাহিনীর অতি সামান্য পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি, পবিত্র হয়েছি।

রাধাষ্টমী, ১৩৩৯

শ্রীজলধর সেন

সন্ধ্যাকালে বিজলী-

সদ্গুণশালিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পৃ. ৭

গ্রন্থাভাষ

হাসি-খেলার বয়স শেষ হইতে না হইতেই যে তাহার উজ্জ্বল ক্রীড়া-ক্ষেত্র অন্ধকার করিয়া দিয়া পলাইয়া যায়, তাহার সেই কয়েক দিনের খেলা-ধূলার কথা সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিলে লেখকের মোহাপযশ অনিবার্য্য। শোকার্ত্তের পক্ষে তাহা যশ ও বর দুইই।

যে কাহিনী লিখিতে লেখক অগ্রসর, তাহা লিখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রতীচ্য-আব্‌হাওয়া-দূষিত হিন্দু-সমাজ নিজ কর্ম্মফলে আপন স্ত্রী কন্যা ভগিনীর চিরন্তন স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা হইতে অধুনা বহুল পরিমাণে বঞ্চিত। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে সনাতন-ভাব-বিদ্বেষী হিন্দু রক্তবীজের মত যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাহার ফলে সমাজে যে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে, তাহা স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিপ্লবেও হিন্দুর মহাগৌরবের মাতৃমূর্ত্তি এখনও সম্যক্‌রূপে লুপ্ত হয় নাই। তাহার ফলে হিন্দুর নাম পৃথিবীর ইতিহাসে এখনও সমুজ্জ্বল। তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসারিণী এক মহিমময়ী বালিকার স্মৃতি অবলম্বনে এই পুস্তকের অবতারণা।

অকালে তো কত ফুলই শুকাইয়া যায়! কয়জন তাহাদের প্রতি ফিরিয়া দেখে? কয়জনইবা তাহাতে সহানুভূতির বেদনা অনুভব করেন! হিন্দু-

কন্যা, হিন্দু-ভগিনী, হিন্দু-জায়া হইয়া সংসারে সে দুইদিনের জন্য আসিয়াছিল মাত্র, দুইদিনেই সকলের হৃদয় সে জয় করিয়া গিয়াছে কেন ?

সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী বংশে বালিকা জন্মগ্রহণ করে। স্বনামধন্য ডাক্তার সূর্য্যকুমার বালিকার পিতামহ। সূর্য্যকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র সুশীল প্রসাদের তিন পুত্র—বিমানচন্দ্র, বিকাশচন্দ্র ও বিজয়চন্দ্র। বিজয়ের পর বিজলীরাণীর জন্ম। তাহাদের জননী, সুবিখ্যাত ডাক্তার কেদার নাথ দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা দুহিতা।

লেখকের অক্ষমতা হেতু ভাব-সম্পদ ও লিপি-চাতুর্য্যের অভাব এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হইলেও ইহা অতিরঞ্জিত দোষে দূষিত মনে করিবার হেতু নাই। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কন্যার চিতাভস্ম হতভাগ্যের সর্ব্বাঙ্গে এখনও প্রলিপ্ত রহিয়াছে। সেই ভস্ম মাখিয়া পিতা কি কখনও কন্যার অবিকল প্রতিকৃতি ভিন্ন অন্য কিছু আকাঙ্খা করে ?

জন্মকথা

যে সৌর ভাদ্রে দেবকীনন্দন জন্মগ্রহণ করেন, যে পূতমাসে কৃষ্ণানুরাগিনী শ্রীরাধা অবতীর্ণা হ'ন, সেই ভাদ্র মাসেই অষ্টমী তিথিতে শুক্লপক্ষে রাত্রি সার্দ্ধচারি ঘটিকায় ডাক্তার কেদার নাথের কলিকাতার বাটীতে আনন্দ-কল্লোলের মধ্যে পদ্মপুষ্পনিভ একটী কন্যা ভুমিষ্ঠা হয়।

সংবাদ প্রচার হইবা মাত্র পুরবাসীগণ সূতিকাগারের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত—নবজাতার সম্বর্দ্ধনায়। কক্ষান্তর হইতে আগমন করিয়া গৃহস্বামীও ব্যস্তভাবে সূতিকাগারে প্রবেশ করেন।

শিশু ও প্রসূতি যথাবিধি পরীক্ষান্তর তিনি তাঁহার দৌহিত্রীকে উত্তোলন করিয়া সাহ্লাদে বলেন—"ঈস্ এ যে একেবারে মেম্!" স্বামীর হর্ষোক্তিতে তদীয় গৃহিনী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—"দেখেছ, ঠিক্ বাপের মত। সেই মুখ, সেই চোখ্, সেই নাক!"

কন্যা সম্বন্ধে উপস্থিত জনগণের আলোচনা ও "গবেষণা" কথঞ্চিৎ শমিত হইলে প্রসূতির কনিষ্ঠ খুল্লতাত-পত্নী, শিশু-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অস্ফুট স্বরে প্রসূতিকে বলেন—"দ্যাখ্ রে দ্যাখ্, কোলে তোর লক্ষী এসেছে।" গৃহ-কর্ত্রী যখন তথায় পুনরাগমন করিয়া তাঁহার কন্যাকে সংবাদ দেন—"সুশীলকে টেলিগ্রাম করা হ'ল," সেই মুহূর্ত্তে মুদিতনয়না মানবিকা ক্রন্দনের সুর তুলিয়া সকলকে অন্যমন করিয়া দেয়।

পিতৃনামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর এই সাড়া তৎকালে রঙ্গ ব্যঙ্গের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু এই অস্থিরতার যে কোনো নিগূঢ় তত্ত্বই ছিলনা, সে কথা কে বলিতে পারে? কঠিন শিলায় নিক্ষিপ্ত হইয়াও যদি সদ্যজাত বিষ্ণু-মায়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিবার শক্তি থাকে, তবে পরমাত্মীয়ের

অনুপস্থিতি জনিত ব্যথার অনুভূতি কি একেবারেই অসম্ভব? শিশু না দেব-শিশু!

পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীর "ওসিয়ানা" বাষ্পীয়পোতে ভারতসাগরের উর্ম্মিমালা 'ঠেলিয়া' কন্যার পিতা তখন লণ্ডনের পথে অগ্রসর হইতেছেন। "ওসিয়ানা" যখন এডেনের কাছাকাছি, তখন তাঁহার সহযাত্রী ডাক্তার এস্ সি সেনগুপ্ত একটী বেতার-বার্ত্তা তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। আবরণ উন্মোচন করিয়া বার্ত্তাটী পাঠ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া সেনগুপ্ত মহাশয় তাহা পাঠ করেন—"*A baby Safely born, mother and child doing well.*" সেদিন বুধবার, সকাল বোধ হয় আটটা।

পূর্ব্বরাত্রিতে ভারতমহাসাগর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দিঙ্‌মণ্ডল ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছাদিত হইয়া যাত্রী মাত্রেরই প্রাণে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ক্রমে বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হয় এবং নাবিকেরা শশব্যস্তে লাইফ্‌বোট্‌ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখে। বায়ুর বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে জাহাজখানির অবস্থা এমন হইয়া পড়ে যে যাত্রীদের "ডেকে" থাকা আর সম্ভবপর হয় নাই। সকলকেই নিজ নিজ ক্যাবিনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নৈশ-ভোজনকালে সে রাত্রিতে অনেকেই অসুস্থতা-নিবন্ধন অনুপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর যাত্রীগণ একে একে "ডেকে" আসিয়া আবার উপস্থিত হ'ন। প্রকৃতি তখন কতক পরিমাণে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জাহাজের আর সে দোলন নাই, কিন্তু আকাশের চাঁদ তখনও মেঘে ঢাকা।

সেই মহা-নিশায় কলিকাতায় কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, আর প্রায় মধ্য রাত্রিতে "ওসিয়ানা" জাহাজে কন্যার পিতার নিদ্রা-ভঙ্গ হয় এক মধুর স্বপ্ন দর্শনে। স্বপ্নে চকিত-নয়না, প্রফুল্ল-বদনা সহধর্ম্মিনীর করাঙ্গুলী মধ্যে একটী স্বর্ণাভ-পুষ্প তিনি দর্শন করেন। প্রাতে বেতার-বার্ত্তা

প্রাপ্ত হইলে স্বপ্নের সার্থকতা তাঁহার বোধগম্য হয়। স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া ভগবানের নিকট এবার যে তাঁহারা কন্যাই ভিক্ষা করিয়াছিলেন!

আনন্দাতিশয্যে অধীরতা প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে ও সহযাত্রীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় তিনি নিজ ক্যাবিনে যাইবার পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময়ে চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় তাঁহাকে 'পাক্‌ড়াও' করিয়া বলেন—"বাহাদুর ছেলে বটে, পুরস্কৃত হ'বার যোগ্য। তা দেখ লণ্ডনে পৌছেই হে-মার্কেট-হোটেলে এক পেট্—বলা রৈল গো।" অমনি চারিদিকে ধ্বনি—"বাঃ, আর আমরা বুঝি বাদ্!" চোখে মুখে হাসি ফুটাইয়া দাশ মহাশয় বলেন—'তোমরা! কি অধিকারে? ও *in anticipation of luck* বুঝি! তা বেশ, *Let us all meet and drink the health of the newborn*" যথাকালে লণ্ডনে এই আনন্দোৎসব সম্পন্ন হয়।

কনিষ্ঠপুত্র বিজয় চন্দ্রের জন্মের পর হইতে প্রসূতির স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। সুতরাং এবার অন্তর্বত্নী অবস্থায় সকলেই তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। কন্যা ভূমিষ্ঠা হইবার অল্পদিন পূর্ব্ব হইতে কিন্তু গর্ভভারজনিত কিঞ্চিৎ গ্লানি ব্যতীত অন্য কোনো উপসর্গই তাঁহার ছিলনা। তাঁহার দেহ উত্তরোত্তর শ্রীশালিনী হয়। লণ্ডন যাত্রার পূর্ব্বে পত্নীর নষ্ট-স্বাস্থ্যের এইরূপ অভাবনীয় উন্নতি দর্শনে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও স্বামী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

শিশুর জন্ম-সংবাদের পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ পায় যে, প্রসবকালে প্রসূতিগণকে যে পরিমাণে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহার এক চতুর্থাংশও এই কন্যা তাহার মাতাকে প্রদান করে নাই এবং তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে মাতার স্বাস্থ্য ও শ্রী অধিকতর উন্নতি লাভ করে। জন্ম

মুহূর্ত্ত হইতেই সেই জন্য এই কন্যা সকলের হৃদয়ে তাহার বৈশিষ্টের একটা গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়।

নামকরণ

সর্ব্বাধিকারী বংশে ২৫ পর্য্যায়ে সকলেই "নাথ" ; যথা—যদুনাথ, ব্রজনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, কেদারনাথ। তৎপর পর্য্যায়ে সকলেই "কুমার", যথা—প্রসন্নকুমার, সূর্য্যকুমার, আনন্দকুমার, রাজকুমার। "কুমারের" পুত্রেরা "প্রসাদ" ; যথা সুশীল প্রসাদের সহোদরগণ—সত্যপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ, সুরেশপ্রসাদ, নগেন্দ্রপ্রসাদ, বিনয়প্রসাদ ও মুনীন্দ্রপ্রসাদ।

অষ্ট বিংশতি পর্য্যায়ে "প্রসাদ" দিগের পুত্রগণ "চন্দ্র" হইয়া বসে। কেবল তাহাই নহে। এই পর্য্যায়ের কন্যাগণের ও তাহাদের সহোদরের নামের সহিত এক বিষয়ে মিল্ থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। "প্রসাদের" দলের প্রায় সকলেই স্ব স্ব পুত্র কন্যার নামকরণ সময়ে কোনো একটী অক্ষর বাছিয়া লইয়া সেইটী তাহাদের নামের আদ্যক্ষর করতঃ নাম প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। লেখকের তিন পুত্রের নাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "ব" আদ্যক্ষর করিয়া তাহাদের সকলেরই নামকরণ হয়। বাছাই করিয়া কন্যার উপযুক্ত নাম রাখিতে পিতা মাতাকে কোনো কষ্টই স্বীকার করিতে হয় নাই। বেতার-বার্ত্তায় জন্ম-সংবাদ প্রাপ্তি হেতু কন্যা "বিজলী" নামে অভিহিতা হয়। জলি, জুলজুলি, বিল্লি, বুলবুলি, ডলি, আরও যে তাহার কত আদরের নাম হয়, তাহার সংখ্যা নাই। বড় হইয়া সে "বিজলীরাণী" হইয়া বসে। আর তাহার বাবার কাছে সে "বাবী", মায়ের কাছে মা। জামতাড়ার বৃদ্ধ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, চৌধুরী সাহেব বিজলীর

স্বহস্ত-প্রস্তুত চা পানে, তাহার তারিফ্ করিতে করিতে বিজলীর নাম গোলমাল করিয়া তাহাকে “বিচলা” নামে অভিহিত করায় বিজলীর চোখে মুখে রুদ্ধ হাসির সৃষ্টি হইয়াছিল।

মাতুলালয়ের পুরাতন দাস দাসীদের বিজলী, “মাসী”। পিত্রালয়ের দাসী “বৌ” এর সে “রাজা”। মায়াময়ী সকলকে এমন অচ্ছেদ্য মায়ায় আবদ্ধ করে যে তাহাকে প্রাণ-ভরিয়া ভালবাসিয়াও তাহাদের সাধ মিটিত না। কি করিয়া আরও আদর করিবে, তাহারা তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইত— নিত্য নূতন নামে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিত। সখী ও শিষ্যাবর্গ তাহার কত নামই সৃষ্টি করে!

‘আয় মা লক্ষ্মী আমার’ বলিয়া জননী যখন কন্যাকে আদর সোহাগ করিয়াছেন, আর অপূর্ব্ব দীপ্তিতে, সহাস্য বদনা কন্যা মাতৃবক্ষে ঢলিয়া পড়িয়া তাঁহাকে পুলকিতা করিয়াছে, মাতৃনামের সার্থকতা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হইয়াছে।

সন্তান আর কোন্ নামে মায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে!

আশীর্ব্বচন

লণ্ডনে পৌছাইবার পরের সপ্তাহে বিজলীর পিতা কলিকাতা হইতে অনেকের পত্র প্রাপ্ত হন। তাহার মধ্যে কয়েকখানি উদ্ধৃত হইল।

শ্রীগুরুদেবের পত্র।

তোমার পূজনীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পত্রে তোমার নবজাতা কন্যার কথা সব অবগত হইলাম। কন্যার জন্ম নক্ষত্রাদি সকলই শুভ—কন্যা অতীব

সুলক্ষণা। কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সে যেন দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া চির-সৌভাগ্য-শালিনী হয়। * * * * আমার একান্ত বাসনা, যথাসময়ে নিজহস্তে তাহার অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পন্ন করি। * * * * যাহা শুনিতেছি, তাহা হইতে মনে হয় যে এ কন্যা পরমধর্ম্মশীলা ও অশেষ গুণবতী হইবে। তাহাকে নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। * * *

বিজলীর মাতামহের পত্র।

অতি সহজেই কন্যা ভুমিষ্ট হয় * প্রসূতি ও শিশু উভয়েই বেশ ভাল আছে। দৌহিত্রী বেশ হৃষ্টপুষ্ট * দেখিতে শুনিতে ভালই হইবে বোধ হয়। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবিনী হইয়া সে আমাদের সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুক্।

বিজলীর মাতামহীর পত্র।

* * * যা ভয় করেছিলুম্ তা'র কিছুই হয়নি, সহজে প্রসব হয়। * নাত্‌নী টুক্‌টুকে মোটা সোটা হয়েছে, ঠিক্ তোমারি মত। চোখ্ মুখ ভারী সুন্দর। মেয়ে পেয়ে মা খুব খুসী। যত্ন করে খুব। টেলিগ্রাম্ পেয়েই নাম রেখেছো? * * এর মধ্যে এমন দুষ্টুমির হাসি হাসে * ভারী ঠাণ্ডা। তা'র মা কোঁৎ কোঁৎ কারে দুধ খাওয়ায়, চুপ্ ক'রে খায়। আমি আর সেজবৌ নাত্‌নী নিয়ে হৈ হৈ কর্‌ছি। আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হয় * মুখে আর কি কর্‌বো?

বিজলীর ছোটমাসীমার পত্র।

বিজলী ঠিক্ বিজলীর মত হয়েছে—আপনি এখন সাহেব কিনা

ভাই! আমার কিন্তু একটা নালিশ আছে। দিদি কেন সকলের চেয়ে বিজলীকে বেশী ভালবাস্‌বে? * আমারও বিজলীকে বড্ড ভাললাগে। সে আপনার মত দুষ্টু হ'বেনা। তা'র মোজা, টুপি আমি বুন্‌ছি সরযূও কি কি কর্‌ছে * * * *।

বিজলীর জ্যেষ্ঠতাত

ডাক্তার সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারির পত্র

ছোট বৌমা নির্ব্বিঘ্নে এক কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন. এ সংবাদ জাহাজেই পাইয়াছ, শুনিলাম। প্রসূতি ও কন্যা উভয়েই শারীরিক ভাল। বড়-বৌ তোমার কন্যাকে সিম্‌লায় গিয়া দেখিয়া আসিয়া তাহার খুব সুখ্যাতি করিতেছিলেন।

বিজলীর মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত

স্যার্‌ দেবপ্রসাদের পত্র

তুমি লণ্ডন যাইবার সময়ে নানা কারণে আমার মন এতদূর চঞ্চল হয় যে সে চাঞ্চল্য প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে হাওড়া ষ্টেসনে যাইয়া তোমাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে আমার সাহসে কুলায় নাই। তুমি যাইবার পরে আমার এই প্রথম পত্রে তোমাকে যে একটী শুভ সংবাদ দিতে পারিতেছি, ইহা ভাগ্যের কথা। সবই ভগবানের ইচ্ছা। সতত তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিও, সমস্তই মঙ্গল হইবে। * * * ভগবদেচ্ছায় কন্যা ও জননী উভয়েই কুশলে আছেন। করুণাময় তোমাদের সুখে রাখুন। ইতিমধ্যে সিম্‌লায় যাইয়া আমি সংবাদ লইয়াছি। কেদার বাবু খুব খুসী। কথাবার্ত্তায় বোধ হইল, দৌহিত্রী

তাঁহার মনোমতই হইয়াছে—হৃষ্ট পুষ্ট, সুশ্রী, সুলক্ষণা। ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবিনী ও সৌভাগ্যশালিনী করুন। * * * *

বিজলীর বড় পিসিমার পত্র

বিজলীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। * * * তোমার দুষ্টু মেয়ে আমার সঙ্গে কথা কহিল না, কেবল হাসিতে লাগিল—বোধ হয় রূপের গরবে। * * * দিব্যি মেয়ে—ঘর যেন আলো ক'রে রয়েছে। ভগবান তা'র বাড়্‌বাড়ন্ত করুন। * * *

বিজলীর জননীর পত্র

* * মেয়ে চেয়েছিলে, মেয়ে পেয়োছো। কবে এসে দেখ্‌বে? *

ইণ্ডিয়ান্‌ আর্ট-স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল্‌

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল চক্রবর্ত্তীর পত্র

বাহাদুর ছেলে বটে! কথা নেই, বার্ত্তা নেই, একেবারে কোল্‌কাতা থেকে লণ্ডনে! তা'রপর, দেশটা কি দিয়ে তৈরী দেখ্‌লে? মাথা দিয়ে হাঁটতে হচ্ছেনাতো? তা' এখন কর আর না কর, দেশে ফিরে কিছুকাল পরে এখানেই সে কার্য্য কর্‌তে হবে, তা'র খবর রেখেছো কি? খবর আর রাখনি, বগে গন্ধ পেয়েই দে চম্পট্‌!

ভয় নেই হে, ভয় নেই। ব্রাহ্মণের ছেলে আমি, তোমায় অভয় দিচ্চি। শরতের মা'র মুখে সব কথা শুন্‌লুম্‌। * * খুকি, স্বর্গের জিনিস্‌। তা'র জন্য তোমায় কারো কাছে মাথা নীচু কর্‌তে হ'বেনা। আমি তা'কে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমার উঁচু মাথা সে আরও উঁচু ক'রে রাখবে * * *।

বিজলীর
পিতামহ
পিতা
জ্যেষ্ঠভ্রাতগণ
ও
ভ্রাতৃত্রয়।

সুরেশপ্রসাদ, সত্যপ্রসাদ, সূর্য্যকুমার, দেবপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ
মুনীন্দ্রপ্রসাদ, নগেন্দ্রপ্রসাদ, সুশীলপ্রসাদ, বিনয়প্রসাদ,
বিজয়চন্দ্র, বিকাশচন্দ্র, বিমানচন্দ্র।

সদ্যজাতা রক্ত-মাংসপিণ্ড মাত্র সেই কৃষ্ণের জীবটীর মধ্যে এমন কি অসাধারণত্ব সকলে দেখিতে পান যে তাহাতে উল্লসিত হইয়া সকলেই তাহার জয় ঘোষণা করেন! জন্মগত সংস্কার বলিয়া একটা কিছু যে আছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। পণ্ডিতেরা বলেন, সংস্কারানুযায়ী জীব, মাতৃগর্ভে বাসকালেও নিজ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয় এবং ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাহার স্বধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করে। অলোকসামান্য রূপ লইয়া বিজলী জন্ম গ্রহণ করে নাই। তাহাকে দেখিয়াই কিন্তু সকলে তাহাকে ভালবাসিয়াছে। ডাক্তার মৃগেন্দ্র লাল মিত্র কথায় কথায় বলেন- "*The baby is an acquisition.*" প্রোফেসর্ সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের অভিমতে-"দিব্যি মেয়ে, এমন বড় একটা দেখা যায়না।" স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষের বিধবা পত্নী বিজলীকে দেখিয়া সোল্লাসে বলেন—"কী সুন্দর, বেঁচে থাক্"। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে বিজলীর অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বালিকা হয়ত তাঁহাদের নয়ন-পথে কত শত পতিত হইয়াছে, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে বিজলীর জয় গান করেন, সংসারে তাহা সুদুর্লভ।

মাতৃক্রোড়ে

কোনো কোনো গৃহস্থের ঘরে কন্যা যেন একটা আপদ বালাই। পণ-প্রথা যে ইহার মূল কারণ, সে কথা না বলিলেও চলে। বিজলীকে কিন্তু তাহার জনক জননী ঈপ্সিত ধনের মত সাদরে বরণ করিয়া ল'ন। সে কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে তাঁহারা বড় আশায় নিরাশ হইতেন।

সাধের কন্যা বিজলী! পিতা তাহার সাগরপারে। কন্যাকে লইয়া

বিজলীর মাতা আনন্দবিভোরা। তাঁহার শিশুপুত্রদের ভার তিনি নিজ জননীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত। বিজলী কিন্তু চক্ষের সম্মুখে অষ্ট প্রহর থাকা চাই, নতুবা তাঁহার অস্থিরতার আর সীমা থাকিতনা।

অষ্ট প্রহর মাতৃসান্নিধ্যে থাকা বিজলীর অভ্যাস হইলেও নিতান্ত অপরিচিত বা অপরিচিতার ক্রোড়ে যাইতে সে কখনো আপত্তি করে নাই। তবে ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। প্রবাদ, শিশু লোক চিনিতে পারে। কোনো কোনো পরিচিত ব্যক্তির সাদর-আহ্বান বিজলী সর্ব্বদা উপেক্ষা করে, কিন্তু বহু অপরিচিত ব্যক্তির ক্রোড়ে স্বচ্ছন্দে গমন করিয়াছে। সে যাহা হউক, প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিকে শিশু তাহার মধুর হাসি হইতে কখনো বঞ্চিত করে নাই।

জন্মকাল হইতে মাতৃপার্শ্বে শায়িতা বিজলীকে কেহ কখনো রোদন করিতে দেখে নাই। মাতৃ-চক্ষুর সহিত নিজ চক্ষু মিলিত করিবার শক্তি লাভ করিবার পর নিজ পার্শ্বে জননীকে সে যখন দেখিতে না পাইয়াছে, তাহার চঞ্চল নয়ন সকাতরে ব্যাকুল-দৃষ্টিতে ঈপ্সিত মূর্ত্তির চারিদিকে অন্বেষণে ব্যর্থ হইয়া নবীন অধরোষ্ঠ অভিমানে কুঞ্চিত করতঃ ক্রন্দনের উদ্যোগ করিলে নিকটস্থিতা দাসী বা আত্মীয়ারা নানা উপায়ে তাহার মনোরঞ্জনে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছে। জননী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে আর কোনো গোলই নাই। আনন্দাবেগে হস্তপদ সঞ্চালনে, নয়ন-কোণে অপার্থিব হাসি ফুটাইয়া জননীর সহিত কন্যার তখন কত নীরব কথা! সেই অপূর্ব্ব কথোপকথনে দুইজনেই তন্ময়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি কাহারও নাই। মাতা পুত্রীর ঈদৃশ ব্যবহারে গৃহস্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। শিশুর দুগ্ধপানের সময় যে বহুক্ষণ উত্তীর্ণ! কচি-মুখে-কচি-হাসির লহর তুলিয়া কন্যা মাতৃ সঙ্গ-সুখে বিভোর। ক্ষুধা অপনোদনের তখন

অবসর কোথায়? জননীও কন্যা-সোহাগে আনন্দস্ফীতা। "ঠাণ্ডা মেয়েকে" যথা সময়ে দুগ্ধপান করাইতে অবহেলার অপরাধে জননী বার বার অভিযুক্তা হইয়াছেন। কন্যার মুখচুম্বন করিয়া সেই অভিযোগের যাথার্থ্য সম্বন্ধে শিশুকে তিনিও প্রশ্ন করিয়াছেন। দেববালা তাহার কোমল অধরে স্বর্গের ছানিত কিরণ পরিস্ফুট করিয়া অভিযোগের অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত অনিয়মেও তাহার এই সময়কার স্বাস্থ্য ছিল দেখিবার মত। রূপের ডালি লইয়া বিমল হাসিতে সকলের চিত্ত সে আকর্ষণ করিত।

প্রবাসী পিতার আগ্রহে তিন মাসের কন্যার আলোক-চিত্র গৃহীত হয়। এত অল্প-বয়স্ক শিশুর চিত্র গ্রহণ বিশেষ কঠিন ব্যাপার হইলেও পিতার সাধ পূরণ করিতে বিজলী তাহা অত্যন্ত সরল করিয়া দেয়। ক্ষণেকের জন্য এক অদৃশ্যশক্তির অনুবর্ত্তিনী হইয়া তিন মাসের কন্যা পুত্তলিকাবৎ স্থিরভাবে উপবেশন করতঃ শিল্পীর চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দেয়।

"মেঘের পর মেঘ জমিয়া" আকাশের কোলে সৌদামিনী যখন খেলা করিয়া বেড়াইত, মাতৃক্রোড়স্থিতা বিজলীর চঞ্চলতার তখন আর সীমা থাকিত না। জননীর পরিধেয় বস্ত্রের অংশ বা হস্তাঙ্গুলী বা অন্য কিছু প্রাণপণ শক্তিতে আকর্ষণ করিয়া মাতৃক্রোড়ে শিশু কখনো নিজ মুখ লুকাইত, কখনো বা জননীর মুখপানে সকাতরে চাহিয়া প্রবাস-স্থিত বিষাদিনীর ন্যায় অবস্থান করিত। সৌদামিনীর খেলা শেষ হইলে বিজলী যেন পরিত্রাণ লাভ করিত।

হাঁটি-হাঁটি-পা-পা

অহর্নিশ কোলে কোলে থাকিয়া বিজলী বোধ হয় কতকটা অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। কেননা, যে বয়সে শিশুরা হামা দিতে চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বিজলীকে সে কাযে্য রত হইতে দেখা যায় এবং তাহার অল্প কালের মধ্যেই হামা দিতে সে বেশ পোক্ত হয়।

এই বয়সে শিশুদিগের কত দুর্ঘটনার কথা শুনা যায়। একটী দিনের জন্যও বিজলী সে আপদ ঘটাইয়া গৃহস্থকে বিব্রত করে নাই। হামা দিতে দিতে হাসির তুফান তুলিয়া সকলকে সে আনন্দ দানই করিত।

যেমন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বিজলীর হামা দিবার অভ্যাস হয়, দাঁড়াইতে, চলিতেও শিক্ষা করে সে অপরাপর শিশুর তুলনায় অনেক পূর্ব্বে। চলিতে শিখিয়া শিশু যখন দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার ক্রীড়া-সঙ্গী ও সঙ্গিনীদিগের আবেদন নিবেদনে জননী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। বিজলীকে সঙ্গে না লইয়া তাহারা খেলা করিতে যাইবে না। স্তব-স্তুতিতে কার্য্যোদ্ধার করিয়া সকলে পূর্ণোদ্যমে খেলা করিত। খেলায় বিশৃঙ্খলার অবতারণা কেহ করিলেই মুহুর্ত্তের জন্যও বিজলী সে স্থানে আর থাকিত না। সঙ্গে সঙ্গেই খেলা ভাঙ্গিয়া যাইত। যথানিয়মে খেলা করিতে সকলে প্রতিশ্রুতি না দিলে তাহাতে পুনরায় যোগদান করিতে বালিকা কিছুতেই স্বীকৃতা হইত না। তাহাকে তুষ্ট রাখিতে তাহারা খেলার নিয়ম পালনে তৎপর হয় এবং ক্রমে নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই বয়ঃকনিষ্ঠার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়।

দিন দিন সকলের নিকট বিজলীর সমাদরে তাহার কনিষ্ঠাগ্রজ বিজয় অন্তরে তাহার প্রতি ঈর্ষাভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। একদা দিবাভাগে

নিদ্রামগ্না বিজলীকে একাকিনী পাইয়া বালক তাহার কণ্ঠপেষণে উদ্যত, এমন সময়ে তাহাদের জননী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। পুত্রের কাণ্ড দেখিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠেন। তাহাতে বিজলীর নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। নিদ্রা-ভঙ্গে বিজয়কে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বিজলীর কী মধুর হাসি! লজ্জায় বিজয় তখন অধোমুখে দণ্ডায়মান থাকে। সমাগত গৃহবাসীগণের কৌতুক-হাস্যে বালক যখন কাঁদিয়া উঠে, বিজলী তাহার হাত ধরিয়া আধ আধ ভাষে বলে—"তল খেলা কলি"। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান হইতে সে তাহাকে লইয়া যায়। তদবধি ঘরে বাহিরে অন্যান্য বালক বালিকার অপেক্ষা বিজয়ের সহিত খেলা করিতেই তাহার সমধিক যত্ন দেখা যাইত। সহোদরার স্বচ্ছ আনন্দে বিজয়ের মনের গ্লানি শীঘ্রই দূর হয়। বিজলী হইল তখন তাহার নয়ন-তারা।

অন্নপ্রাশন

ফাল্গুন মাসে সাত মাসের বিজলীর অন্নপ্রাশন হয়। অনেকের প্রতীতি ও ধারণা যে পুত্র-সন্তানের অন্নপ্রাশন হউক্, আর নাই হউক্, কন্যার অন্নপ্রাশনকার্য্য সম্পাদন করা নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা ভবিষ্যতে তাহার অন্নহানি হইবার সম্ভাবনা। সেই কারণে স্বামী প্রবাসে থাকিলেও বিজলীর জননী কন্যার অন্নপ্রাশনের আয়োজন যথাসময়ে করিয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বেচ্ছায় এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। বাহ্যিক আড়ম্বর না করিয়া দেবতার "প্রসাদ" মাত্র মুখে দিয়া কন্যার অন্নপ্রাশন কার্য্য সম্পন্ন হয়: বিজলীর মাতামহী গুরুজনবর্গের পদধূলি দৌহিত্রীর মস্তকে স্পর্শ করাইয়া শুভকার্য্য সম্পূর্ণ করেন।

"মুখে ভাত্" দিবার সময়ে বিজলী আনন্দে অধীরা। গুরুদেব তাহাকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া "প্রসাদ" তাহার মুখে তুলিয়া দিলে শিশু প্রীতিভরে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে থাকে। সে কার্য্য সমাধা হইলে গুরুদেব বিজলীর মাতামহীকে বলেন, "মা আজ আমি কৃতার্থ। লক্ষ্মী স্বয়ং সহাস্যবদনে সন্তানের হস্ত হইতে অন্নগ্রহণ করিয়াছেন।" তাঁহার সেই কথায় উপস্থিত আত্মীয়ারা সন্ত্রস্তা হইয়া বলে, "একি বল্‌ছেন, ওতে মেয়ের অকল্যাণ হবে যে!" শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক তিনি তাহাতে বলেন, "কিছু ভয় নাই মা, কিছু ভয় নাই। স্বয়ং কল্যাণময়ীর আবার অকল্যাণ!"

পরবর্ত্তী 'মেলে' প্রেরিত, গুরুদেবের একখানি পত্র লণ্ডন-প্রবাসী শিষ্যের হস্তগত হয়। অন্নপ্রাশনের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার একাংশে তিনি লিখেন—"বাবা, মহাভাগ্যে আমার লক্ষ্মী দর্শন ঘটিয়াছে। তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আমার অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে। বিশ্বাস কর বাবা, কন্যা তোমার স্বয়ং লক্ষ্মী।"

অন্নপ্রাশন অনাড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইলেও বহু ব্যক্তি সময়োচিত উপঢৌকন দানে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বিধবা, সিভিলিয়ান্ মিষ্টার জে এন্ রায়ের পত্নী, কাশ্মীরের ডাক্তার এ মিত্র মহাশয়ের পত্নী, আরও অনেকে রক্তসম্বন্ধ না থাকিলেও বিজলীর জীবনের একটী প্রধান শুভ মুহূর্ত্তে "নিষ্ক্রিয়" থাকিতে পারেন নাই।

উৎসবের প্রায় একমাস পূর্ব্বে লণ্ডন-প্রবাসী বিজলীর জ্যেষ্ঠ মাতুল শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র বিজলীর জন্য মূল্যবান পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার ভগ্নীপতি সে সব দেখিয়া বলেন, "ব্যাপার কি?"কিশোর প্রভাস গম্ভীর হইয়া বলে—"ভাগ্নীর ভাতে মামাকেই তো সব কর্‌তে হয়"। ভাগিনেয়ীকে চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি

স্নেহ-রসে আপ্লুত হইয়া তাহার অন্নপ্রাশনে শ্রেষ্ঠ উপহার প্রেরণ না করিয়া প্রভাস থাকিতে পারে নাই। সে তো আপনার জন মাতুল, তাহার এই স্নেহ স্বাভাবিক। কিন্তু শ্বেতদ্বীপবাসিনী সম্পূর্ণ অপরিচিতা কোনো কোনো শ্বেতাঙ্গ-মহিলা কি কারণে বিজলীর মোহে আকৃষ্টা হইয়া পড়েন? মিষ্টার্ গ্লাস্ ও তাঁহার পত্নী বিজলীর পিতার সহিত এক বাটীতে রাসেল্ স্কোয়ারে বাস করিতেন। মিসেস্ গ্লাস্ সময়ে অসময়ে *for darling Bijoli* নানা উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। ক্যানেডা নিবাসী মিষ্টার ডভ্‌কোট্ লণ্ডন হইতে তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের সময়ে বিজলীর নাম করিয়া ক্যানাডার চিত্রাদি প্রদান করেন। লণ্ডনের ষ্টাইলো-পেন-ব্যবসায়ী মিষ্টার্ গেনার্‌ও একটী মূল্যবান পেন্ বিজলীকে উপহার দেন। ক্রিষ্ট্যাল্-প্যালেস্ নিবাসী মিষ্টার্ জোন্‌স্ বিজলীর আলোক-চিত্র দেখিয়া অবধি তাহার কথা উঠিলেই শতমুখে বালিকার প্রশংসাবাদ করিতেন। তাহাতে তাঁহার বিদূষী-কন্যা সহাস্যবদনে পিতাকে কখনও কখনও বলিতেন, "বিজলী তোমায় যাদু করেছে বাবা, আমরা দেখ্‌ছি এবার সব ভেসে যা'ব।" জ্ঞান-বৃদ্ধ জোন্‌স্ সাহেব তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিতেন, "মাধুর্য্যময়ী বালিকা যাদুকরীই বটে!"

স্বদেশে বিদেশে সকলের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে কন্যার অন্নপ্রাশন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিজলীর জনক জননী মনে করেন।

পিতৃ-সন্নিধানে

কোলাহলময়ী লণ্ডন নগরীর বৈচিত্র্যময় শত সহস্র আমোদ-প্রমোদ, প্রবাসী পিতার হৃদয় হইতে কোনো কালেই বিজলীর চিন্তা অপসৃত করিতে পারে নাই। কন্যার অন্নপ্রাশনের পর গুরুদেবের পত্র, কন্যা-মুখ সন্দর্শনের আগ্রহ তাঁহার শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। তাহার উপর বিমান, বিকাশ বাঁকা বাঁকা হরফে তাঁহাকে লেখে বিজলীর কথা। বিজলীর জননী লেখেন, বিজলী কেমন করিয়া হাসে, হাত্-পা ছুঁড়িয়া কেমন করিয়া খেলা করে, অভিমানে কেমন করিয়া তাহার কচি ঠোঁট্ দুটী ফুলায়। তাহার মাতামহী লেখেন, "বিজলী বড় স্যায়না দুষ্টু হচ্ছে।" মাতামহ লেখেন, "*The baby is growing fine.*" সুতরাং দীর্ঘাবকাশের সময়ে প্যারিস্ ভিয়ানার বিশ্ব-বিশ্রুত চারুশিল্প সন্দর্শনের লোভ দূর করিয়া দিয়া কন্যা-মুখ দর্শনের মোহ তাঁহাকে "সাত্ সমুদ্র তের নদীর" পার হইতে কলিকাতায় আনিয়া ফেলে। বিজলীর বয়স তখন কিঞ্চিদধিক এক বৎসর।

তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইবার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে তাঁহার মধ্যম পুত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। অশ্রু ও হাসির মাঝে সুতরাং পিতা পুত্রীর প্রথম মিলন! সিম্লার বাটীতে উপস্থিত হইবার অনতিবিলম্বে তিনি অবগত হ'ন, জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্-দিগের অনুকম্পায় গৃহস্থের বিশ্বাস যে বালিকার সহোদরদিগের প্রতি দৃষ্টি-দোষ হেতুই বিকাশের এই কঠিন পীড়া। সকলের এইরূপ বিশ্বাস ও ধারণায়, বিস্ময়, বেদনা ও ক্ষোভের তাঁহার অন্ত ছিলনা। কন্যা সম্বন্ধে জ্ঞান-বৃদ্ধ জোন্স্ সাহেবের প্রশংসা-বাণী ও কুলগুরুর অভিমত যে

তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। সেই কন্যা অশুভকারিণী! পীড়িত পুত্রের শয্যা-পার্শ্বে প্রথমে উপবেশন করতঃ স্নেহাদরে তাহাকে প্রফুল্লিত করিয়া কন্যার সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশে পরে কক্ষান্তরে যাইয়া তিনি দেখেন, কয়দিন যাবৎ মাতৃ-ক্রোড় বঞ্চিত হইয়াও সরল মধুর হাসিতে তাহার কক্ষ উছলিত।

পরিচিতাদিগের সঙ্গে একজন যখন সেই কক্ষে উপস্থিত হয়, স্থির-দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে তখন চাহিয়া পরিচিতাদের মধ্যে সে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে! "বাবা রে তোর বাবা, চিন্‌তে পারছিস্ না" রবে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইলে চকিতে হাসি-রাশি ছড়াইয়া, পার্শ্বে দণ্ডায়মানা জননীর ক্রোড়ে মহোল্লাসে শিশু ঝাঁপাইয়া পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পিতৃবক্ষে সে তাহার স্থান অধিকার করিয়া লয়—চিরপরিচিতের মত পরস্পরেব মধ্যে স্নেহ-বন্ধন সুদৃঢ় করিয়া দেয়।

পিতার আগমনে পীড়িত বালকের আনন্দাতিশয্য হেতু চিকিৎসকেরা প্রতিক্রিয়ার বিশেষ ভয় করেন। ঘটেও তাহাই। অপরাহ্ন হইতে বালকের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হয়। পরদিন চিকিৎসকেরা ম্রিয়মান; আত্মীয় স্বজন সকলেই অস্থিরচিত্ত—কারণ, বালকের জীবনের আর কোনো আশা নাই। পলে পলে চক্ষের সম্মুখে মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর সন্তানের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শোক-বিহ্বল পিতা যখন পুত্রের বক্ষের উপর পতিত হইয়া হাহাকার করিতে থাকেন, তখন ভিষক-প্রবর ৺কৈলাস চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলেন, "দাদা অস্থির হয়ো না, কোনো ভয় নেই, ছেলের তোমার কোনো অনিষ্ট হ'বে না। তা' যদি হয়, আমি আর চিকিৎসা-কার্য্য কোর্ব্বনা। তোমার আসাতেই বালক মহৌষধি পেয়ে গেছে।" কলিকাতার বহু গণ্যমান্য চিকিৎসক তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বালকের জীবনের আশা

ত্যাগ করেন। কৈলাস বাবু কিন্তু প্রত্যেককেই বলেন, "চিকিৎসা-বিদ্যায় যদি আমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকে, তা'রই বলে আমি দম্ভ ক'রে বল্‌ছি,—"কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই।" তাঁহারই বাক্য সত্য হয়। বালক পুনর্জ্জীবন লাভ করে।

দৃষ্টি-দোষ দূষিতা শিশু-কন্যার এ কয়দিন পীড়িত ভ্রাতার ত্রিসীমায় যাইবার পথ রুদ্ধ থাকে। পিতা মর্ম্মাহত হইলেও প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করিবার অবসর প্রাপ্ত হ'ন নাই। সঙ্কটকালে কৈলাস বাবুর উক্তি—"তোমার আসাতেই বালক মহৌষধ পেয়ে গেছে" ও পরে বালকের মৃত্যুর দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—এই দুয়ের আলোচনা করিয়া পিতার মনে হয় যে সত্যই যদি ভ্রাতার প্রতি বিজলীর দৃষ্টি-দোষ বর্ত্তিয়া থাকে এবং কৈলাস বাবুর অভিজ্ঞতার যদি কোনো মূল্য থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধপোষ্যা এই কন্যা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিবলে পিতাকে পীড়িত ভ্রাতৃপার্শ্বে আনয়ন করিয়া নিজেই সে দোষ খণ্ডন করিয়া দিয়াছে।

নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে সত্যবান মরণ বরণ করিয়াছে শুনিয়া মাণ্ডব্য একদিন বলিয়াছিলেন, "এ হ'তে পারেনা, সৌভাগ্যবতী হও ব'লে আজ যে আমি তা'কে আশীর্ব্বাদ করেছি। সেই সাবিত্রী পতিহীনা! এ হ'তে পারেনা"। তাহা হয়ও নাই। ঋষির আশীর্ব্বাদে সতী শিরোমণি মৃতপতির দেহে জীবনী-শক্তির পুনঃ সঞ্চার করণে সৌভাগ্যবতী হ'ন। মুমূর্ষু বালকের দেহে জীবনী-শক্তি যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কণ্ঠলীন, ভিষক-প্রবর তখনও বলিলেন যে কোনো অনিষ্ট হইবে না। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তিনি চিকিৎসা-কার্য্য ত্যাগ করিবেন। কারণও তিনি নির্দ্দেশ করেন। সেই কারণের সূত্র ধরিয়া ও তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া মৃত-প্রায় বালকের জীবন রক্ষার নিমিত্ত মাত্র

তিনি হ'ন। সাবিত্রী অসাধ্য সাধন করে সতীর এক-প্রাণতার বলে। কে বলিতে পারে যে জন্মগত ভ্রাতৃবাৎসল্যের অকৃত্রিম আকর্ষণে শিশু-ভগিনী সহোদরের জীবন রক্ষা করে নাই; আর এই অসামান্য ভ্রাতৃ-বাৎসল্যের আভাযে জ্যোতিষীরা রজ্জুভ্রমে সর্প দেখেন নাই!

সহোদর নিরাময় হইলে জননীকে বিজলী পূর্ব্ববৎ অধিকার করিয়া বসে। দিবাভাগে, 'বা-ব্বার' সঙ্গে তাহার কত ভাব—সাক্ষাৎ পাইলে 'বাব্বার' কোলে ঝাঁপাইয়া পড়া! রাত্রিকালে কিন্তু সে, আর তাহার জননী, তাহার জননী, আর সে—অন্য কাহারও সঙ্গ তাহার বাঞ্ছনীয় নহে। সহোদরদিগের খেলা-ধূলা, পিতার আদর-সোহাগ, কিছুরই সে তখন প্রার্থিনী নহে। নিরবচ্ছিন্ন মাতৃ-ক্রোড় তখন তাহার আশ্রয়-স্থল।

এইরূপে শিশুকাল হইতে পিতামাতার আদর সোহাগ সে ষোল আনাই উপভোগ করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার এ স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাত্রিকালে মাতৃপার্শ্ব সে অব্যাহত রাখিয়াছে। সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থানও কেহ কখনো অধিকার করিতে পারে নাই।

অবকাশের সময় যতই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে, পুত্র কন্যাদির বিচ্ছেদ-ভাবনায় ম্রিয়মান হওয়া পিতার ততই স্বাভাবিক। বিজলীর সহাস্য কলরব কিন্তু তাঁহাকে এই ভাবে অভিভূত হইতে দেয় নাই। আর বিদায়ের দিন, নানা রঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়া দিয়া বিদায়কালীন বেদনা উপলব্ধি করিবার অবসরও সে তাঁহাকে দেয় নাই।

যাত্রাকালে মেয়েকে "সরাইয়া" রাখিবার ব্যবস্থা আত্মীয়ারা করেন। হাসির লহরী তুলিয়া বিজলী কিন্তু যাত্রা-কালে আসিয়া উপস্থিত। পিতার হাত ধরিয়া তাহার কি জয়োল্লাস! শিশুর জয়-গর্ব্বে সকলে হাসিয়াই আকুল—বিদায়-যাত্রা হইল তখন উৎসবানন্দ!

পিতাপ্রবাসে

পিতার প্রবাস যাত্রার পরদিন বিজলী পিতৃপ্রদত্ত উপহারাদি লইয়া উপবিষ্টা, এমন সময়ে জননীর কনিষ্ঠ খুল্লতাত (শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস, রায় বাহাদুর) তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা কোথা ?" বালিকা এতটুকু ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, "বিলেট্" । পরক্ষণেই প্রশ্নকারীকে আশ্বাস দিবার জন্য সে বলে, "আছ্‌বে, আছ্‌বে ।" কোনো কোনো আত্মীয়া এ কথার প্রতিবাদ করায় বিজলী তাঁহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছে মাত্র ।

বিলাতী ডাক্ যাইবার দিনে বিজলী তাহার মাতা, মাতামহী প্রভৃতি সকলকেই অভিনিবিষ্ট চিত্তে লিখন-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া শীঘ্রই সেই কার্য্যানুকরণে রত হয় । সহোদরেরা যখন আঁকা বাঁকা হরফ্-টানা কুঞ্চিত পত্রখণ্ড তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া বলিত, 'বাবার চিঠি', বালিকা তখন মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া চঞ্চল চরণে জননীর নিকট যাইয়া বলিত, "বাবা তিতি ।" যেমন কথা, তেমনি কাজ । পিতাকে পত্র লিখিবার জন্য দোয়াত, কলম, পেন্সিল, কাগজ সব ওলট্ পালট্ করিয়া, হাতে মুখে কালি মাখিয়া, পেন্সিলের শীস্, কাগজের টুক্‌রা মুখের ভিতর পুরিয়া বালিকা গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত । শান্তস্বভাবা বিজলীর এ সময়ে সংযম থাকিত না । তাহার কার্য্যে কেহ বাধা দিলে, চোখ রাঙ্গাইয়া সে বলিত, "বাবা তিতি ।" বালিকার দৃঢ়তায় হাস্য সম্বরণে অসমর্থ হইয়া সেই ব্যক্তি তখন তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইত, আর বিজয়-গর্ব্বে বিজয়িনী বিজলী সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে অস্বীকৃতা হইয়া 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত । কন্যাকে মুক্ত করিয়া জননী তাহাকে

পত্র লিখাইতে বসিলে তবে সে শান্ত হইত। তাহার হাত ধরিয়া কোনো প্রকারে "বাবা—বিজলী" লিখাইয়া তিনি পত্র সাঙ্গ করিয়া দিতেন। বিজলীর তখন মৃগ-শিশুর মতই গতি! হস্তে তাহার বিজয়-নিশান। "বাবা তিতি, বাবা তিতি" রবে গৃহ হইত মুখরিত। আর সুদূর সাগর-পারে বিজয়-নিশান—অমূল্য লিপি যখন পৌঁছাইত, তাহার কয়টী অস্পষ্ট অক্ষরে পিতার প্রাণে করিত সুধা-বৃষ্টি।

বালিকার 'বাবা-তিতি' লিখিবার জন্য যেমন আগ্রহ, বাবার চিঠি পাইবার জন্যও তেমনি আগ্রহ। প্রতি "মেলে" চিত্রাদি প্রাপ্ত হইলে সে সকল লইয়া জননীর সহিত তাহার কী আন্দোলন! সাথীদিগের সহিত কত কথা! তাহাতেও তাহার তৃপ্তি নাই। মাতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কন্যা বলে, 'বাবা?' আর তাহার জননী, স্বামীর আলোক-চিত্র দেখাইয়া বলেন, "এই যে।" বালিকা অমনি পিতৃ-প্রতিকৃতির প্রতি অনিমেষ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া সোৎসাহে বলে, "বাবা, বাবা, বাবা।" বলে, আর হাততালি দেয়। কন্যার সেই সাগ্রহ-মধুর-আহ্বান, ব্যোম্ তরঙ্গ ভেদ করিয়া প্রবাসে পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হয় কিনা, কে বলিবে! তিনি কিন্তু শত কার্য্যের মধ্যে থাকিলেও সময়ে সময়ে অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন। তাহা ঘটিয়াছে, কন্যার কচিমুখের মধুর হাসি আকস্মিক ফুটিয়া উঠিতে।

বিজলীর বয়স এখনও দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই। সাথীর তাহার অভাব নাই। যত লোভনীয় খেলাতেই তাহারা মত্ত হউক না কেন, বালিকা তাহাতে প্রলুব্ধা হইত না কিছুতেই। দুর্ব্বল-দেহ মধ্যমাগ্রজের কাছে কাছে তাহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। সহোদরের প্রফুল্লতার জন্য তাহার সহিত অভিনব কৌতুকই সহোদরার প্রধান ক্রীড়া। গৃহস্থের অনবধানতা বশতঃ যদি কখনো বিকালের আহারাদিতে কোনো

প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিত, ত্বরিৎগতিতে মাতৃ-সন্নিধানে তখনি উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করাইতে বালিকা তৎপর হইত। আর গৃহিনীগণ বলাবলি করিতেন—"মেয়ে এসব শিখ্‌ছে কোথা থেকে।"

গ্রামোফোন্ ও হার্‌মোনিয়মের উপদ্রব—মাতৃগর্ভ হইতেই বিজলীকে সহ্য করিতে হয়। কারণ,মাতুলালয়ের বালক বালিকার দল এ দুটিকে কঠোরভাবে নির্য্যাতিত করিতে কোনো কালে সুযোগ পরিত্যাগ করিত না। এ বিষয়ে বালক বালিকাদের উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। এইসব দেখিয়া শুনিয়া জননীর নিকট যাইয়া হাসিতে হাসিতে বিজলী বলিত—"গান।" জননী আদর করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুমি গান গাইবেনা ?" শিরঃ-সঞ্চালনে বালিকা তাহার অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে।

স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ, তাহার জননীর কাছে পাঠ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। পাঠের সময়ে দুই বৎসরের বিজলী একবার জননীর প্রতি, একবার পাঠরত সহোদরের প্রতি নীরবে চাহিয়া তাহাদেরই সন্নিকটে বসিয়া থাকিত—কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করিত না। পাঠের কোনো ব্যাঘাত ঘটাইত না। পাঠ শেষ হইলে লিখন্ পঠনের দ্রব্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করিতে সে ভ্রাতাকে সাহায্য করিত।

জননীর নিত্যপূজাকালে বিজলী পূজা দেখিয়া পূজান্তে পূজারিণী জননীকে চিরদিনই সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। কখনো কখনো জননীর অনুকরণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার ক্ষুদ্র করাঙ্গুলী সংযোগে নানাবিধ মুদ্রা করতঃ সে তাঁহাকে বিস্ময়ান্বিতা ও উৎফুল্লা করিয়াছে।

যাহা দিয়া সাজাইলে কন্যাকে ভাল দেখায়, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কত রকম করিয়া জননী তাহার কেশ বেশের পারিপাট্য করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাহার কোনোরূপ বিরক্তি-ভাব নাই, কোনো বিদ্রোহ নাই, ক্লান্তির চিহ্ন মাত্র নাই। হাসির রোলে তাহার মাতার সকল সাধ সে

পূর্ণ করিয়াছে। একদিনের জন্যও কোনো বিশেষ পরিচ্ছদের বায়না সে করে নাই।

মধ্যমাগ্রজ সুস্থ হইলে সাথীরা ক্রীড়া-ক্ষেত্রে বিজলীকে পূর্ণ ভাবে আবার প্রাপ্ত হয়। অল্পদিন পরে দেখা যায় যে তাহার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুদের সঙ্গই তাহার অধিকতর লোভনীয়। শিশুরাও তাহাকে পাইলে আর কিছু চাহিত না।

পিতার প্রত্যাগমনে

বিজলীর বয়স যখন প্রায় তিন বৎসর, তখন তাহার পিতা লণ্ডন হইতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় পৌঁছাইবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে দিনের মধ্যে শতবার জননীকে বিজলী বলিত, "বাবা এলে, আর যেতে দোব না।" নাচিয়া নাচিয়া সকলকে সে সংবাদ দিত, "বাবা আস্‌বে।" কৌতুক করিয়া যদি কেহ বলিত, "না আস্‌বে না", জননীর নিকট ছুটিয়া গিয়া এক নিশ্বাসে বিজলী বলিত, "কিচ্ছু জানে না ওরা, না মা?" পিতা আসিলে সে কি করিবে, তাঁহাকে কি কি গল্প শুনাইবে—সকল বিষয়েই জননীর সহিত কন্যার অষ্টপ্রহর পরামর্শ। পুনরাগমন উৎসবের আয়োজন বালিকা এই ভাবেই করিতে থাকে। যথাসময়ে তাহার চঞ্চল আঁখিযুগলে নিখিল বিশ্বের মধুরতা মাখাইয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে পিতার বক্ষলীন হইয়া আনন্দের সাগরে আপনাকে সে ভাসাইয়া দেয়।

এতদিন বিজলী, পিতার সম্বন্ধে মাতা, মাতামহী এবং অন্যান্য সকলের সহিত গল্প করিয়া দিন যাপন করিত। সেই গল্পের পিতা,

আজ তাহার সম্মুখে। হাসি-গল্পে বালিকা তাই তাহার অধিকাংশ সময় পিতৃসমীপে অতিবাহিত করিতে উৎসুক হইত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া মাতা কর্তৃক পরিপাটীরূপে সজ্জিতা বালিকা নাচিতে নাচিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রাতরাশের একাংশ গ্রহণ করিতে করিতে কত সংবাদই তাঁহাকে না দিবে! সহোদরদিগের মধ্যে কে শয্যাত্যাগ করিয়াছে, কে করে নাই—কত কথাই সে বলিয়া যাইবে। বাবা আবার "বিলেত্ পালিয়ে যা'বে" কিনা জিজ্ঞাসা করিবে। উত্তর শ্রবণে আশ্বস্তা হইয়া পিতাকে সে বুঝাইয়া দিবে, "পচার ঝি বড় দুষ্টু, মিছামিছি বলে—বাবা পালিয়ে যা'বে।" এইরূপ নানা প্রয়োজনীয় আলোচনার মধ্যে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য তাহাকে লইয়া যাইতে কেহ তথায় উপস্থিত হইলে বিজলী বিরক্ত হইয়া বলিয়াছে— "আঃ! দেখতে পাচ্চ না, বাবার সঙ্গে কথা কচ্ছি।" দাস দাসীদিগকেও তুমি ভিন্ন "তুই" বলিয়া বিজলী কখনো সম্বোধন করে নাই। এই অভ্যাস আপনা হইতেই তাহার হইয়াছিল।

কেবল গল্প করিয়াই বিজলী স্থির থাকিত না। দিবা, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে পিতার আহারের সময়ে যে স্থানেই সে থাকুক না কেন, পিতার নিকট তাহাকে আসিতেই হইবে। পরমাগ্রহে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে আহার করাইতে তাহার বড় আনন্দ। আহার শেষে ভুক্ত আহার্য্য দ্রব্য সহোদরদিগের মধ্যে বণ্টন ও নিজেও একাংশ গ্রহণ, তাহার তৎকালীন কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। বালিকার কার্য্যে আত্মীয়ারা নানা রঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সে ক্ষান্ত হয় নাই। হাসিয়া ও হাসাইয়া তাহার করিবার যাহা, সে তাহা করিয়া গিয়াছে।

শিশুকালে তাহার চিত্ত-স্থৈর্য্য অসাধারণ বলিয়া সকলের নিকট প্রতীয়মান হয়। বিলাত হইতে সদ্য প্রত্যাগত পিতা, সাহেব মেমেদের পুত্র কন্যাদের মত তাহার bobbed hair করিয়া দিবার জন্য একদিন ক্ষৌরকারকে আদেশ করেন। আদেশ মত ক্ষৌরকার তাহার কার্য্যে অগ্রসর হয়। কন্যা কিন্তু তাহাকে সে কার্য্য করিতে দিতে কিছুতেই সম্মত হয় নাই—বলে, "আমার যেমন চুল্ কাটা হয়, তেমনি কেটে দাও।" এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে পিতা স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কন্যার দৃঢ়তায় শেষে তাহার নিকট তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হয়।

বালিকার প্রায় চারিবৎসর বয়সের সময়ে, মান্দ্রাজের তদনীন্তন এ্যাকাউন্টেন্ট্-জেনারল্ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্তের সাদর আহ্বানে ডাক্তার কেদারনাথ দাস সস্ত্রীক শ্রীশ্রীরামেশ্বর ধামে যাত্রা করেন। বিজলীর জননীও তাঁহাদের সহিত গিয়াছিলেন। বিজলী, পিতার নিকট কলিকাতাতেই রহিয়া যায়। তাহার মাতামহীর এক সহোদরা তাহাকে দেখা শুনা করিবার ভার গ্রহণ করেন। যাত্রা-কালে জননী কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলেন, "তোমার জন্য কত ভাল ভাল খেল্না আন্তে যাচ্ছি।" কন্যা সহাস্যে তাঁহাকে বিদায় দান করে।

জননী চলিয়া যাইবার পর প্রথম রাত্রিতেই শয্যায় শয়ন করিয়া বিজলী বলে, "মাসিমা" (মাতুলদিগের দেখাদেখি সেও তাঁহাকে মাসীমা বলিত) "মা কেন এখনও এলনা।" মাসীমা বলেন, "এই যে এল ব'লে দিদি। তোমার জন্য অনেক খেল্না কিন্‌বে কিনা, তাই দেরী হচ্ছে। মা এসে বল্‌বে, আমার সোণার বিজলী।" এই কথা শুনিতে শুনিতে বালিকা

ঘুমাইয়া পড়ে। পরদিন প্রাতঃকালে পিতার নিকট আসিয়া তাহার প্রথম সংবাদ, "বাবা, মা এসে বল্‌বে আমার সোণার বিজলী।"

রামেশ্বর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে সকলের দশ-বারো দিন বিলম্ব হয়। বিজলী কিন্তু এক দিনের জন্যও কান্নাকাটি করে নাই; কেবল বলিয়াছে, "মা এসে বল্‌বে আমার সোনার বিজলী।" "ভাল ভাল খেল্‌নার" কথা সে মুখেও আনে নাই। মাতৃগত-প্রাণা বালিকা দিনের পর দিন মাতার অদর্শন জনিত বেদনা নীরবে সহ্য করে। "সোনার বিজলী" হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে সে তাহার আঁখিজল নিবারণ করিতে সক্ষম হয়। পিতা মাতার আদর সোহাগ তাহার বড়ই লোভনীয় বস্তু।

বিজলীর জননী সোনার বিজলীকে কোলে লইয়া সকলকে যখন বলেন—মন্দিরে, খেতে, শুতে, বস্‌তে আমি বিজলীকেই দেখেছি, কন্যা জননীর মুখ পানে চাহিয়া আনন্দ সহকারে বলে, "কেমন যা'বে ফাঁকি দিয়ে?" বলিবার কি ভঙ্গি!

ইহার কয়েক মাস পরের কথা। জননীর কনিষ্ঠা সহোদরা টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইলে দিনের পর দিন তাহার অদর্শনে বিজলী বড়ই উন্মনা হইয়া পড়ে। একদিন গৃহস্থের অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণান্তর রোগিণীর কক্ষাভিমুখে সে ধাবিতা হয়। ব্যাপারটী তাহার পিতার গোচরে আসিলে তিনি সস্নেহে কন্যাকে বলেন, "ওদিকে যেয়োনা, গেলে মাসীর বেশী অসুখ কর্‌বে।" ইহার পরে বিজলী একদিনের জন্যও সেদিকে যায় নাই। রোগিণীর যখন সঙ্গীন অবস্থা, বিজলী তাহার পিতাকে বলে, "বাবা, মাসী চ'লে যাবে।" চমকিত হইয়া পিতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে সে আপন মনে বলে—"যাক্ গে।"

উত্তরোত্তর রোগিণীর অবস্থা মন্দ হয়। মৃত্যুর দুই তিন দিন পূর্ব্বে পরপারের যাত্রী. বিজলীর জন্য এত অস্থিরতা প্রকাশ করে যে গৃহস্থ

তাহাকে দাসী-ক্রোড়ে রোগিণীর কক্ষদ্বারে উপস্থিত করাইতে বাধ্য হয়। মুমূর্ষর কম্পমান হস্ত দুইখানি তখন প্রিয়জনের সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রসারিত। শিশু সেই সমাদরের প্রতিদানে প্রীতি-হাস্যে তাহাকে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বোধ হয় ইঙ্গিত করে। রোগিণীর কণ্ঠে বিজলীর নাম বারেক উচ্চারিত হয়। বিজলীর তাহাতেও হাসি। এ হাসির অন্তরে কী ইঙ্গিত লুক্কাইত ছিল, কে জানে!

ইহার পর কখনো যদি মাতামহী দৌহিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "মাসী কোথায়", বালিকা অঙ্গুলী নির্দ্দেশে অসীম নীলাকাশ দেখাইয়া দিয়াছে। কখনো কখনো, মৃতা আত্মীয়ার আলেখ্যের সম্মুখে সে নীরবে অবস্থান করিয়াছে। তাহার তখনকার ভাব লক্ষ্য করিয়া, সে যে স্থূল জগতে আছে, সে কথা কাহারও মনে হয় নাই।

মাতামহী তাঁহার মৃতা কন্যার প্রিয় পরিচ্ছদ ও পুস্তকাদি গুছাইয়া রাখাইয়া দিবার ইচ্ছা, জামাতার নিকট প্রকাশ করিলে, সেই সকল দ্রব্যাদির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিজলী পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, "কি হ'বে এ সব?" পিতা বলেন, "তুলে রেখে দিতে হবে, নৈলে নষ্ট হ'য়ে যা'বে কিনা।" উত্তর শ্রবণে বিজলী, কয়েকটী জিনিষ নাড়াচাড়া করিয়া বলে, "ওরা রাখুক্, তুমি এসো—গল্প শুন্‌বো!" পিতা গল্প বলিতে বসিলে, ম্লান-মুখে সে বলে, "গল্প ভাল লাগ্‌ছে না, থাক্।" পিতার কাছ্‌ ঘেঁসিয়া আবার সে বলে, "তুমি বসো, ওদিকে যেয়োনা।" কি সে কাতর নিবেদন! করুণো-দ্ভাসিত নয়ন যুগল তাহার, কাহার জন্য কী এক কল্পিতবেদনায় ব্যাকুল।

পিতার বক্ষ উপাধান করিয়া বালিকা কতক্ষণ নীরবে থাকে। মৃতা আত্মীয়ার স্মৃতির দহনে কন্যার এই বিষণ্ণতা মনে করিয়া পিতা তাহাকে নানা কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করেন। চকিত-হাস্যে পিতার মুখপানে চাহিয়া বালিকা তাহার চক্ষু ফিরাইয়া লয়। কন্যাকে অন্যমনস্কা করিতে

পারিয়াছেন ভাবিয়া, পিতা সন্তোষ লাভ করেন। নিয়তির অ-করুণ পরিহাস তখন আকাশে বাতাসে কী রঙ্গই করিয়াছে!

তাহার জননীর খুল্লতাত-ভগ্নী, আট নয় বৎসরের আশা, প্রায় একই সময়ে টাইফয়েড্ রোগাক্রান্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে সে সুস্থ হয়। তৎপরে দুর্ব্বল ও স্ফূর্ত্তিহীনা আশার একজন প্রধানা সঙ্গিনী হয় সেই চারি বৎসর বয়স্কা বিজলী। এই সময়ে দিবাভাগের অধিকাংশ এবং রাত্রিতেও প্রায় দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত জননীর দেখা সাক্ষাৎ বিজলী বড় একটা পাইত না। কারণ, তিনি তাঁহার জননীর নিকটই তখন অবস্থান করিতেন। মাতৃ-সোহাগিনী বিজলী তজ্জন্য কোনো অভিযোগ করে নাই।

পিতৃ-গৃহে

কনিষ্ঠা ভগ্নির মৃত্যুর অল্পকাল পরে প্রভাসচন্দ্র কিছুদিনের জন্য এডিন্‌বরো হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিল। এডিন্‌বরোয় ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রথম দর্শনেই বিজলী মাতুলানীর প্রতি আকৃষ্টা হয়। নব-বধূটীও বালিকার বেশ-ভূষা খেলা-ধূলা এবং সর্ব্বোপরি তাহার স্বভাবের জন্য তাহার সঙ্গ লোভনীয় মনে করেন। কালে বিজলী, তাঁহার সখী ও কন্যার স্থান অধিকার করিয়া বসে। জননী ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত বিজলীর পিত্রালয়ে গমনকালে এই নূতন মানুষটী অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া বিদায়-বেদনা ঘনীভূত করিয়া দেয়।

বিজলীর পিত্রালয় গমনের পর, মাতামহী অবসর পাইলেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন,—সঙ্গে তাঁহার নববধূ। কন্যা-গৃহে পদার্পণ করিয়া

দৌহিত্রীকে লইয়া মাতামহীর কতই রঙ্গ! ননদিনী-কন্যার সেই সরস সমাদরে লজ্জানম্র বধূটী আনন্দে উৎফুল্লা! হৃদয় নিহিত কত ভাব লইয়া প্রিয় সঙ্গিনীর সহিত তাঁহার মধুর দৃষ্টি-বিনিময়! সেই দৃষ্টি-বিনিময়েই, বিচ্ছেদ-ব্যথায় ব্যথিত দুইটী কোমল হৃদয়ের গুরুভার এক লহমায় লাঘব হইয়া যায়। বাক্যের আড়ম্বর নাই, অভ্যর্থনার সমারোহ নাই, মিলনের আনন্দে উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হইত না। স্বচ্ছ-প্রীতির মৃদু-মধুর তরঙ্গে উভয়ের হৃদয় উদ্বেলিত। বালিকা ও কিশোরীর অপূর্ব্ব মিলনানন্দ!!!

বিজলীর বিনয় নম্রতায় প্রতিবেশী কন্যাগণ শীঘ্রই তাহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠা বা কনিষ্ঠা যে কোনো বালিকাই হউক না কেন, বিজলীর সহিত সখ্য স্থাপনে কাহারও কিছুমাত্র অন্তরায় ঘটে নাই। গল্পে, খেলায় ও অনাবিল প্রীতির তরঙ্গে সাঙ্গপাঙ্গদিগের হৃদয়ে সে এমন একটা মধুর ভাবের প্রবাহ তুলিত যে কেহই তাহাকে সমশ্রেণী ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিত না।

নূতন দলের সহিত পরিচিতা হইবার পূর্ব্বে, পুরাতন ক্রীড়ার সাথী-দিগের স্মৃতি মাতুলালয়ের ভৃত্য সোমর ও তস্য বালক-পুত্র জগাইএর কল্যাণে বিজলীকে ব্যথিতা করিতে পারে নাই। পুত্রের শাসন উদ্দেশে সর্ব্বদা সোমরের জলদগম্ভীর গর্জ্জন ও তাহা সত্ত্বেও জগাইএর অষ্টপ্রহর নর্ত্তন ও কুর্দ্দন, আনন্দ-স্বভাবা বালিকাকে যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিত। সময়ে সময়ে সোমরের অতিরিক্ত শাসনের ফলে জগাই "দিদিমনির" আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পশ্চাদ্ধাবিত সোমরের তখন নিরুপায় হইয়া পলায়িত পুত্রের প্রতি ক্রোধব্যঞ্জক দৃষ্টি। সে "মাসীকে" বুঝাইত, "বেটা বড়া সয়তান্।" এই সয়তান্ পুত্রটী কিন্তু দিদিমনির সম্মুখে মেষ-শাবকের মতই নিরীহ। দিদিমনি যদি বলিয়াছে, "জগাই

অত দুষ্টুমি কর কেন ?" উত্তরে জগাই বলিয়াছে, " কুছ্ না করি, খেল্ করি, গান করি, চাচা গোসা হোয়্ বোলে, বাবু গোসা হোগা ।" দিদিমণি তাহাকে সাহস দিয়া বলিয়াছে, "বাবু গোসা হ'বে না, আমি সোমরকে ব'লে দোব - তুমি নাচ, গান, খেল্ কোরো, তবে দুষ্টুমি কোরো না—তা যদি কর, আমাদের সবাই গোসা হ'বে ।" পাঁচ বৎসরের বালিকার সাত বৎসরের বালকের প্রতি এই হিত-বাণী নিষ্ফল হয় নাই।

কেবল খেলা-ধূলা করিয়া বালিকার আর মন উঠিত না। খুঁটী-নাটি সাংসারিক কার্য্য করিতে সে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। জননীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য-প্রণালী নিরীক্ষণ, পাকের ঘরে যাইয়া পাচক পাচিকার রন্ধন-কার্য্য অভিনিবেশ সহকারে দর্শন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় দাস দাসী কর্ত্তৃক গৃহ ও তৈজস পত্রাদির মার্জ্জন্ প্রভৃতি নিরীক্ষণ তাহার নিত্যকর্ম্ম হইয়া পড়ে। অল্প দিনের মধ্যে গৃহের পরি-চ্ছন্নতা ও সৌষ্ঠবতা সম্পাদনের জন্য দাস-দাসীদিগের তত্ত্বাবধান, বালিকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করে। ক্ষুদ্র বালিকার উৎসাহে তাহারা তাহাদিগের সকল কার্য্য হৃষ্টচিত্তেই সম্পন্ন করিত। এই সকল কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শয্যাদি প্রস্তুত করণের ও নিত্য ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ-বস্ত্রাদি সংরক্ষণের সুশোভন পদ্ধতি সে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। ইহা ব্যতীত সাংসারিক সকল কার্য্যে জননীকে সাহায্য করিতে তাহার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। কন্যার উৎসাহে জননী প্রীতা হইয়া তাহার বয়সোচিত কার্য্যাদি শিক্ষা করিবার উপায় করিয়া দে'ন। স্বীয় ঐকান্তিক চেষ্টায় বিজলী অল্প বয়সেই গৃহস্থালীর বিবিধ কার্য্যে অসামান্য নিপুণতা লাভ করে। পাঁচ বৎসরের কন্যার রুটি লুচি ব্যালা দেখিয়া অনেক বয়স্থা রমণীও লজ্জিতা হইয়াছেন। আহার্য্য দিয়া পাত্র সজ্জিত করিবার

তাহার কলা-কুশলতায় সকলে 'পাকা হাতের' নিপুণতারই পরিচয় প্রাপ্ত হন।

পিতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সাধনে কন্যার সযত্ন ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। তাহার সকল কার্য্যে কোমলতার ভূরি ভূরি নিদর্শন বর্ত্তমান! জননীর সেবা করিয়া বালিকার অসীম আনন্দ! সহোদরদিগের প্রতিও তাহার কী ঐকান্তিক যত্ন! তাহার সরল হাস্যে, সুমধুর ভাষে, নির্ম্মল ক্রীড়া কৌতুকে সকলের প্রাণে আনন্দের সহস্র ধারা সে প্রবাহিত করিয়া দেয়।

প্রতিবেশী সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বরাট অল্প দিনের পরিচয়ে বিজলীর এত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন, যে তিনি বিজলীর গুণ-রাশি শত মুখে সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিয়াও তৃপ্ত হইতেন না। তাহাকে নিকটে পাইলে অনিমিষনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বলিতেন, "বেটী যাদের ঘরের বৌ হবে তাদের কী ভাগ্যি!" বিজলীর পিতা একবার তাঁহাকে সহাস্যে বলেন—না, বিজলী আপনাকে ঠকিয়েছে খুব। বরাট মহাশয় তাঁহার আয়ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলেন, "দেখুন আমি জাত্ বদ্যি, ছাইতে না পারি গোড়্ চিনি। বেটী আমায় ঠকাবে? আমি যে মা চিনি।" প্রিন্সিপ্যাল্ ক্ষুদিরাম বসু মহাশয় মধ্যে মধ্যে বিজলীর পিত্রালয়ে পদধূলি দিতেন। যেবার বিজলীর সাক্ষাৎ না পাইতেন সেবার তিনি বলিতেন, "অপরাধ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, নৈলে আনন্দময়ী মা আমার দেখা দিলেন না কেন?"

কন্যার পঞ্চমবর্ষ বয়ক্রম কালে তাহাকে পাঠ্য পুস্তকের সহিত পরিচিতা করিবার বাসনা পিতার মনে উদিত হইলেও মুক্ত কুরঙ্গিনীকে একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন। গল্পে ও কথায় বালিকার প্রাথমিক শিক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়াই তাঁহার মনে হয় ও সেই পথই তিনি অবলম্বন করেন। সহোদরগণের পাঠাভ্যাসকালে বিজলী

কিন্তু স্বেচ্ছায় পাঠাগারে উপস্থিত হইয়া পুস্তক পাঠের ক্রম সকল স্বীয় যত্নে অবগত হয়। সহোদরার এতাদৃশ শক্তি দেখিয়া বিকাশ তাহার জ্ঞান-বিকাশের চেষ্টা করে এবং শেষে তাহার গুরু হইয়া বসে। কয়েক দিবস সে গুরুগিরি করিবার পর বিজলী একদিন পিতামাতার নিকট আসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করে "বিকাশ কিছুই জানে না।" মন্তব্যের কারণ বলিলে বুঝা যায়—যে সকল পাঠ দিবার জন্য গুরুজী উৎসাহ প্রকাশ করেন সে সকলই ছাত্রীর বহুপূর্ব্বে আয়ত্তাধীন হইয়া গিয়াছে।

গুরুভক্তির সেই উচ্ছ্বাসের পর ছাত্রীকে শিক্ষাদান করিতে গুরুমহাশয় আর সম্মত হ'ন নাই। বিজলীরও প্রতিজ্ঞা, "বাবার কাছে পড়বো।" উভয়ের মধ্যে সন্ধি না হওয়ায় কন্যার শিক্ষার ভার অবশেষে পিতাই গ্রহণ করেন। জননী সূচি শিল্পাদি কার্য্য যখন করিতেন, মনোযোগের সহিত কন্যা তখন তাহা নিরীক্ষণ করিত। তাহাতেই শিল্পবিদ্যার অক্ষর পরিচয় বিজলীর হইয়া যায়। সকল কার্য্য নিয়মিতভাবে করিবার অভ্যাস আপনা হইতে তাহার হয়। নানা কার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়াও কোনো বিষয়ে তাচ্ছিল্য বা এতটুকু ফাঁকি কোথাও তাহার থাকিত না।

পশু-সেবায়

মাতামহীর সুরী, কেনারী, ময়না পিঞ্জরে বসিয়া যখন গান করিত বিজলী উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। একা শুনিয়া তৃপ্তি হইত না, মাতুলালয়ের সকল বালক বালিকাকে আহ্বান করিয়া সেই গান সে তাহাদের শুনাইতে বসাইত। গান শুনিয়া নিজ আহারের শ্রেষ্ঠাংশ পুরস্কারস্বরূপ বিহঙ্গদলকে সে প্রদান করিয়াছে।

গৃহপালিত জীব-জন্তুর সহিত সখ্যস্থাপনে বিজলী বিশেষ আগ্রহান্বিতা হইয়া উঠে এবং অল্পায়াসেই তাহাতে সাফল্য লাভ করে। পিতার কৃষ্ণবর্ণ গাভী 'কাজলী' ও তাহার বৎসটী অধিকক্ষণ বিজলীর অদর্শনে অস্থির হইয়া মুহূর্মুহূ হাম্বারবে তাহাকে সে স্থানে আনয়ন করিয়া তবে শান্ত হইয়াছে। ভৃত্যের হস্ত হইতে আহার গ্রহণের অপেক্ষা বালিকা-প্রদত্ত আহার্য্যে তাহারা অধিকতর সন্তোষ প্রকাশ করে। বালিকার তিরস্কারেও স্নেহাদরের আস্বাদন তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য গ্রীবা হেলাইয়া লাঙ্গুল সঞ্চালনে বালিকার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। সহাস্য ধিক্কারে, তাহাদের লজ্জাহীনতা ও তোষামোদ ক্ষমতায় দোষারোপ করিয়া প্রীতি-পুলকনেত্রে বিজলী তাহাদের আদরের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া দিত। প্রীতি-বন্ধনে মানুষ ও পশু তখন একপ্রাণ!

সাময়িক উত্তেজনার বশে বালিকার ইহা ক্ষণিকের ক্রীড়া-কৌতুক নহে। দিবসের মধ্যে শতবার গাভীর পরিদর্শন, পিঞ্জরাবদ্ধ শুক-সারিকে নিয়মিত আহার প্রদান এবং অন্যান্য জীব জন্তুর তত্ত্বাবধান, বালিকার মাত্র ক্রীড়াশীলতার পরিচায়ক কি? জীবজন্তুর সুখ স্বস্তি অটুট রাখিবার

জন্য তাহাদের রক্ষকের সকল কার্য্যে বিজলীর সতত সতর্ক দৃষ্টি। যদি কখনো গাভীর অঙ্গে মলিনতার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইয়াছে, তৎক্ষণাৎ বালিকা স্বয়ং তাহা ধৌত করিয়া দিয়া সোহাগভরে বলিয়াছে, "আহা বড় হ্যানস্থা করে, না? পাপ হবে ওদেরই।" গাভীও বঙ্কিম গ্রীবায় করুণ নয়নে সেই কথার সমর্থন করতঃ সেবিকার নিকট হইতে প্রয়োজনাধিক আদর সোহাগ প্রাপ্তির পথ করিয়া লইত। প্রতিদানে সাধ্যমত ক্ষীরধারা বরিষণে বালিকার অপার স্নেহ-যত্নের ঋণ পরিশোধ করিবার বুঝি বা প্রয়াস পাইত।

দোহনের সময় যে দিন বিজলী উপস্থিত থাকিত কাজলীর ক্ষীরধারার সে দিন আর বিরাম নাই। দুগ্ধের পরিমাণ দর্শনে দোহনকারী বিস্ময়-পুলকে বন্ধুবান্ধবের নিকট বলিত, "দিদিমণি লক্ষ্মী ঠাক্রুণ।"

দুর্ভাগ্যক্রমে কাজলীর একদিন সহসা মৃত্যু হয়। একটা উৎসব উপলক্ষে বিজলী তখন ছিল মাতুলালয়ে। দুর্ঘটনা শ্রবণান্তর শোকে অধীরা বিজলীর কী করুণ ক্রন্দন—নয়নজলে তাহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যায়! বহুক্ষণ শোকে অভিভূতা হইয়া থাকিবার তাহার অবসর ঘটে নাই। মাতৃহারা বৎসটীর চিন্তায় আকুল হইয়া তাহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে সে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সে কার্য্যের ভার অন্য কাহারও উপর সে অর্পণ করিতে পারে নাই। প্রাণপাত পরিশ্রমে, নানা উপায়ে দুগ্ধ তাহার গলাধঃকরণ করাইয়া আশু-মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহাকে সে রক্ষা করে। প্রথম যেদিন বৎসটী দূর্ব্বাদল ভক্ষণে সক্ষম হয়, সে দিন বালিকা মহানন্দে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার প্রতি স্নেহের কি অত্যাচারই করিয়াছিল! ছাগল, বিড়াল, কুকুর, পাখী প্রভৃতি সকল জীবেরই প্রতি তাহার কেমন-একটা প্রীতি-করুণার ভাব ছিল। জনৈক প্রতিবেশীর স্নেহোপহার

সুদৃশ্য সারমেয় শাবক 'পপি'কে সাদরে গ্রহণ করিয়া সাত বৎসরের বিজলী সেই জীবটীর প্রতি এতাদৃশ মমতা প্রদর্শন করে যে দুই দিনের মধ্যেই নূতন স্থানে আগমন হেতু তাহার অ-প্রফুল্লভাব দূর হইয়া যায় এবং নূতন প্রভুর সম্পূর্ণ বশ্যতা সে স্বীকার করে। পুরাতন প্রভুর কথা বিস্মৃত না হইলেও পপি নূতন প্রভুর মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া অতি নিকটস্থ পূর্ব্বাবাসে যাইবার কল্পনা মুহূর্ত্তের জন্যও করে নাই।

বিজলীর সেবা ও শিক্ষার ধারায় পপি অল্পকালের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সারমেয় বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রভুর মনোভাব পপির কিছুই অবিদিত ছিল না। তাহার ইঙ্গিত ও অঙ্গুলী হেলনের অর্থও পপির নিকট সুস্পষ্ট। গৃহ-রক্ষণে, গৃহপালিত জীব-জন্তুর অনিষ্ট নিবারণে পপি সদাই জাগ্রত। দিবাভাগে বা রাত্রিকালে প্রভু নিদ্রিতা হইলে সতর্ক প্রহরীর ন্যায় সে দ্বারদেশে বর্ত্তমান—মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান ত্যাগ করিবে না। যদি কখনো অসুস্থা হইয়া বিজলী শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, কক্ষের দ্বারদেশ হইতে ম্লান-দৃষ্টিপাত করিয়া পপির সেই স্থানেই প্রহরের পর প্রহর অবস্থান। প্রভু সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে কণিকামাত্র আহার করাইতে পারিত না। ইহার জন্য গৃহস্থের বহুতর ভর্ৎসনা ও তাড়না পপি অকাতরে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু সম্মুখে স্থাপিত হইলেও আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি সে ফিরিয়া চাহিত না। সেই সময়ে বিজলী যদি তাহার উচ্ছিষ্ট ফলমূল পপিকে প্রদান করিয়াছে অমৃতজ্ঞানে, সোল্লাসে পপি তৎক্ষণাৎ তাহা গলাধঃকরণ করিয়াছে। পশু এইরূপ পশুভাবেই বুঝি তাহাদের অকৃত্রিম প্রীতি, মমতা, ভালবাসা প্রকাশ করে। মানুষের পন্থা পশুর পক্ষে বোধ হয় বিসদৃশ!

একদিন পপি, রোগ-গ্রস্ত কোন সারমেয় কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া গৃহে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুদ্বয় জবাফুলের মত লাল হয় এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া

যায়। তাহার চঞ্চলতারও সীমা থাকে না। পপির এরূপ মূর্ত্তি বিজলী কখনো দেখে নাই। সুতরাং মৃদু ভর্ৎসনায় পপিকে শান্ত করিবার সে প্রয়াস পায়। যাহার অঙ্গুলি হেলনে পপি প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ অবস্থান করিতে অভ্যস্ত, তাহার ভর্ৎসনাতেও সেই পশুর চঞ্চলতা কিছুমাত্র শমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বালিকা নানা উপায়ে তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে গৃহস্বামী তথায় আসিয়া উপস্থিত হ'ন। পালিত সারমেয়ের তৎকালীন অবস্থায় তিনি সন্দিহান্ হইয়া কন্যাকে অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। পপির অস্বাভাবিক মূর্ত্তি ও পিতার ত্বরিৎ আদেশের অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বালিকা ক্ষুণ্ণমনে স্থান ত্যাগ করে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নত-লাঙ্গুল, রক্ত-চক্ষু, ভগ্ন-কণ্ঠ, অস্বাভাবিক-দৃষ্টি ঘোরতর চঞ্চল পপিকে গৃহস্বামী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কঠিন কশাঘাতেও তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারেন নাই। তাহার গাত্রে জল নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিবামাত্র সে ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকে এবং নানাপ্রকারে তাহার উন্মাদ রোগের পরিচয় প্রদান করে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধ্বংশকরণ ব্যতীত তখন আর অন্য উপায় নাই। মমতাময়ী কন্যার মুখ চা'হিয়া তিনি তাহা না করিয়া তাহার শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দেন। মুক্ত হইবামাত্র পপি ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজপথে বাহির হইয়া যায়। দ্বিতল হইতে বিজলী তখন প্রিয় সারমেয়ের নাম ধরিয়া একটীবার মাত্র আহ্বান করে। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিদ্যুৎ গতিতে ধাবমানা পপি পলকের জন্য তাহার গতি হ্রাস করে. কিন্তু যে কালমোহে সে দ্রুত আচ্ছন্ন হইতেছিল পাছে তাহার আবেশে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রভুর বা তাহার প্রিয়জনের অনিষ্ট করিয়া বসে, সেই ভয়ে স্থান ত্যাগ শ্রেয়ঃ জ্ঞানেই তাহার গতির বেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া পলকে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যায়। ইহার ৪।৫ ঘণ্টা পরে জানা যায় যে

পপির সারমেয় জন্মের অবসান হইয়াছে। সেই সংবাদ পাইয়া সন্তানহারা জননীর ন্যায় বিজলী শোকাকুলা হয়। ইহার পর কত লোক নূতন 'ভাল' কুকুর তাহাকে দিতে চায় তাহা লইতে সে কিছুতে সম্মত হয় নাই।

বালিকার পালিত বিড়াল "পুষী" শাবক হারাইয়া সান্ত্বনা লাভার্থে তাহারই কাছে ছুটিয়া আসিত। ছাগ-শিশু 'ডাকু'র দৌরাত্ম্যে গৃহস্থ অস্থির। নানা অপকর্ম্মে নিযুক্ত ডাকু বিজলীর কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র কিন্তু শান্তশিষ্ট হইয়া অবস্থান করিত। শৃঙ্খলাবদ্ধ চন্দনাকে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিলে, উড়িয়া আসিয়া বালিকার স্কন্ধে বসিয়া কত কথা বলিয়া সে তাহাকে হাস্যমুখী করিবে। বিজলী যেখানে যাইবে, চন্দনাও সেইখানে। কেহ ইহাতে বাধা দিলে চীৎকারে সমগ্র বাটী সে কাঁপাইয়া তুলিত। পরগৃহে পালিত কুকুর, বিড়াল প্রভৃতিও নিমেষের পরিচয়ান্তর বার বার বিজলীর নিকট ছুটিয়া আসিত। বালিকা তাহাদের তাড়না করিলেও তাহারা স্থান ত্যাগ করিত না। কৃত্রিম রোষ, ঐকান্তিক মমতার অনুভূতি লুপ্ত করিতে পারে কি?

বিজলীর কুকুর, বিড়াল, পাখী, ছাগল, এক সঙ্গে খেলা করিত। কেহ কাহারও ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট কামনা করে নাই। এ মনোবৃত্তি পশু কি করিয়া লাভ করে?

পাল-পার্ব্বণে

জননীর নিত্যপূজা দেখিয়া দেখিয়া পূজার ধরণ ধারণ শিশুকালেই বিজলী শিক্ষা করিয়া লয়। ক্রমে শারদীয় পূজা প্রভৃতির সময়ে উৎসাহ ও আনন্দের সীমা তাহার থাকিত না। পিতৃকুলে লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা ও পিতামহীর দুষ্কর ব্রতাদির কথা উঠিলে আগ্রহের সহিত বিজলী তাহা শুনিতে বসিত।

একবার মহাপূজা সন্নিকটবর্ত্তী—পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বিজলী জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের বাড়ী পূজো হবে না?" কৌতুক করিয়া পিতা বলেন, "তুমি যদি কর, হবে।" সাহ্লাদে পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কন্যা বলে, "হ্যাঁ বাবা আমি পূজো কোর্ব্ব, ঠাকুর আনিয়ে দাও।" 'ঠাকুর' আনাইয়া দিতে পিতা প্রতিশ্রুত হ'ন কন্যাও পূজার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

প্রতিমা আনয়ন করা কিন্তু পিতার পক্ষে কঠিন হয়। অন্যান্য প্রতিমার ন্যায় দশভূজা মূর্ত্তি কলিকাতার কুম্ভকারেরা বালক বালিকাদের পূজার সাধ মিটাইবার জন্য প্রস্তুত করে না। কৃষ্ণনগরের মৃণ্ময়ী দশভূজা গৃহশোভার জন্য কিন্তু প্রস্তুত হয়। প্রতিশ্রুতি পালন করিবার নিমিত্ত, তাহাই একমাত্র উপায় স্থির করিয়া পিতা নিশ্চিন্ত হ'ন, কেননা সেইরূপ একখানি প্রতিমা তখন গৃহেই ছিল। পূজার দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিলে কন্যা যখন তাঁহাকে প্রতিমার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তিনি তখন বলেন, "তোমার মাকে ব'লে আলমারী থেকে দুর্গা ঠাকুর বা'র করে নাও।" হতভম্বের মত বালিকা পিতার মুখ পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলে, "সে কি

বাবা, ও যে খেল্‌না ওতেতো আমার পূজো হবে না।" পাঁচ বৎসরের বালিকার সেই কথাগুলি বলিবার ভঙ্গিমায়, চারি সন্তানের পিতার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় নাই। কি বলিয়া কন্যার মনোরঞ্জন করিবেন ভাবিয়া তিনি আকুল এমন সময়ে, "ও মা বিজলী, একবার নেবে এসোতো মা," কাহার সাদর আহ্বান শ্রুতিগোচর হয়। তাহা শ্রবণমাত্র বিজলী নিম্নতলে অবতরণ করে এবং পরক্ষণে মহোল্লাসে পিতার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলে, "বাবা তুমি বড় দুষ্টু হচ্চ—নীচে চল—পূণ্য বাবু ডাক্‌ছেন।" কথার সঙ্গে সঙ্গে কন্যা পিতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বহির্ক্কক্ষে লইয়া যায়। দুইজনে তথায় উপস্থিত হইলে প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী বলেন, "পূজার সময় কত লোক কত মূল্যবান উপহার দেয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি। বিজলী মায়ের জন্য এই মাটির ঢেলাটী এনেছি—আমার নাতির নিজের হাতে তৈরী।"

সম্মুখে মঞ্চোপরি নবীন শিল্পীর প্রাণমন দিয়া গঠিত মৃণ্ময়ী দশভূজা। কর্ণপথে দৈববাণীর ন্যায় ব্রাহ্মণের প্রীতি-মধুর বাণী পার্শ্বদেশে হাস্য-নয়না প্রাণসমা নন্দিনী। অচিন্ত্য, অভাবনীয়, আকস্মিক এই ঘটনা সমূহের সমাবেশে গৃহস্বামী চমৎকৃত। তখন তিনি কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "পূর্ণ বাবুর সঙ্গে যড়্‌ করে বুঝি এই সব হয়েছে?" তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। কন্যা মৃদুকণ্ঠে পিতাকে বলে, "আবার দুষ্টুমি? নিজে সব ঠিক্ করে—আমায় কিছু বলা হয়নি।" পিতা পুত্রীর স্নেহের কলহে ব্রাহ্মণ বলেন, "ব্যাপার কি?" ব্যাপারটী অবগত হইয়া ব্রাহ্মণ বিজলীর মস্তক স্পর্শ করিয়া হর্ষবিজড়িত স্বরে বলেন, "পূজোয় মেতে তোর এই ছেলেকে প্রসাদ দিতে ভুলিস্ নি মা।"

যথাসময়ে বালিকার মহাপূজা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। সরল

প্রাণে মধুর প্রীতি মিশাইয়া পূজারিণীর ধূপ-ধুনার সৌরভে দেবীর আবাহন ও তাহার ক্ষুদ্র প্রাণের ব্যাকুল নিবেদন, দেবীপদে বুঝি সার্থকতা লাভ করে, নতুবা পূজান্তে পূজারিণীর সর্ব্বাবয়ব দিব্যকান্তিতে উদ্ভাসিত হয় কি করিয়া ? স্নিগ্ধ প্রফুল্লতায় সকলের প্রাণ পূর্ণ করিয়া দেয় কি প্রকারে ?

পূজার আয়োজনে ও পূজা করণে বালিকার বিশেষ ব্যস্ততা থাকিলেও মহাষষ্ঠীর প্রাতে জনক-জননী, সহোদরবর্গ এমন কি দাসদাসীকে পর্য্যন্ত নববস্ত্রে ভূষিত করিতে তাহার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশিত হয়। হস্তে তাহার নববস্ত্র, বক্ষে তাহার জননীর স্নেহ, ওষ্ঠে তাহার অনুজ্ঞার বাণী। মূর্ত্ত কল্যাণীরূপে ষষ্ঠী-সমাগমে, সকলের কল্যাণ সমাধানে বয়সে বালিকা হইলেও সুগৃহিণীর কর্ত্তব্যে সে অনুপ্রাণিতা। দেবী-পূজারম্ভের প্রকরণ যাহার এইরূপ, আনন্দময়ী জগন্মাতা সেই প্রীতিময়ী পূজারিণীর অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান করেন সাধ্য কি ? প্রতিবাসীবালকবালিকার আনন্দ-কোলাহলে তাহার পূজা মণ্ডপ মুখরিত। স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, শিশু, যুবা, প্রৌঢ়, সকলে বালিকাপ্রদত্ত প্রসাদ লাভে পরম পরিতুষ্ট। প্রীতি ও তৃপ্তির নিদর্শন তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিরাজিত। এ পূজা যদি দেবীর যথার্থ পূজা না হয় তবে আর কোন্ প্রকার পূজায় বরাভয়দায়িনীর মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় ?

নিজের পূজা সত্ত্বেও বহির্জগতের আনন্দ রাজ্য হইতে চিরানন্দময়ী বালিকা আপনাকে নির্ব্বাসিতা করে নাই। প্রাতে ও অপরাহ্নে দিব্যবেশে ভূষিতা হইয়া জগন্মাতার সকল সন্তানের আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে সে বহির্গত হইত—সঙ্গে তাহার পিতা ও সহোদরত্রয়। সুবৃহৎপূজাঙ্গনের জনতার মধ্যে কমনীয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার প্রতি নিকটস্থ জনগণের প্রশংসমান দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তাহার কিন্তু তাহাতে দৃক্‌পাতও নাই। ধ্যানরতা যোগিনীর মত সম্মুখস্থ দশভূজার প্রতি তাহার দৃষ্টি

নিবদ্ধ। কতক্ষণ পরে স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় বালিকা বলে, "চল বাবা, আমার আবার সব কাজ পড়ে রয়েছে।" গৃহ প্রত্যাগমনকালে স্ব স্ব গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট প্রতিবেশীবর্গের সাদর সম্ভাষণের প্রতিদানে বালিকা প্রফুল্ল নয়নে সকলের পানে চাহিয়া বিমল আনন্দে তাঁহাদের প্রাণ পূর্ণ করতঃ সকলের পূজার আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। পূজার কয়দিন, দুই বেলার মধ্যে এক বেলাও, কেহ যদি তাহাকে দেখিতে না পাইয়াছে তাহার অভিযোগের আর সীমা থাকে নাই।

দশমীতে বিজয়োৎসব। হর্ষ-বিষাদে বিজলীর নয়নে বদনে এক অপূর্ব্ব ভাব। বিদায়-দানের ব্যথায় অভিভূতা কোমল প্রাণ তাহার গুরুজনবর্গের আশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া ও সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠদিগের ঐকান্তিক স্নেহ, প্রীতি ভক্তি অনুভব করিয়া বিয়োগ ব্যথা বিস্মৃত হইতে যেন সে বদ্ধপরিকর। বেদনা জয় করিবার জন্যই যেন বেদনা-কাতর বালিকার এই অপূর্ব্ব বিজয়া-সম্ভাষণ!

পূজার কার্য্যে বিজলীর অভিনব উৎসাহ দর্শনে প্রতিবাসী গোস্বামী মহাশয় নিজ দৌহিত্র দ্বারা ক্ষুদ্র একখানি কালীপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া কালীপূজার বহুপূর্ব্বে তাহাকে উপহার প্রদান করেন। তাহাতে গৃহস্বামী কন্যাকে সহাস্যে বলেন, "কালীপূজোও তাহ'লে হচ্ছে?" কন্যা দায়গ্রস্তার ন্যায় বলে, "কি কোর্‌ব ঠাকুরকে তো উপসী রাখ্‌তে পারব না।" সত্যই ত, সামান্য অভ্যাগতের সাদর অভ্যর্থনা করিতে মানুষ প্রাণপণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করে না, আর পরমেশ্বরীর শুভাগমনে বিজলীর ন্যায় সুগৃহিণী কি নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে? কন্যার নিকট পিতা তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলে বালিকা অভিমান করিয়া বলে, "আমার কাছে ঠাকুরের অমন্ ক'রে আসা কেন? আমিতো আস্‌তে বলিনি।" আদর করিয়া পিতা তখন তাহাকে

বলেন, "আমাকেও তো সব সময় কাছে আসতে বলনা, আমি আসি কেন ?" একথায় পিতা পুত্রীর মধ্যে সব গোল মিটিয়া যায়।

যথাকালে 'ঠাকুর' তো উপবাসী থাকেন-ই নাই, কালীপূজার আনুসঙ্গিক—চৌদ্দ প্রদীপ, আতসবাজী, দীপমালা প্রভৃতি আয়োজনের কোথাও কিছুমাত্র অপ্রতুলতা বালিকা ঘটিতে দেয় নাই।

এই উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে পল্লীস্থ প্রায় সকল গৃহই প্রচুর দীপমালায় আলোকিত হয়। বালিকার তাহাতে কী আনন্দ! পিতৃগৃহের সম্মুখস্থ অলিন্দে দাঁড়াইয়া যখন সে দীপান্বিত পল্লীর শ্রী উপভোগ করিতেছিল, প্রতিবেশী বরাট মহাশয় স্নেহার্দ্রস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "সবাইকে নাচিয়ে দিয়ে মজা দেখছিস্ বুঝি বেটি ?" শুধু সরল হাসি হাসিয়াই বালিকা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেয়। চারিদিকে তখন আতসবাজীর হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি। বালক বালিকাদিগের আনন্দ-কোলাহলে পল্লী মুখরিত। অমাবস্যার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া বিদ্যুদ্বরণীর দিব্য জ্যোতিতে জগৎ তখন উদ্ভাসিত। তাহারই মাঝে দাঁড়াইয়া সরলা বালিকার সেই স্নিগ্ধ মধুর হাসি! অবনত শিরে, প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহার অপরাধ সে মানিয়া লয়। আর তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্যই পল্লীস্থ বালক, যুবা প্রভৃতির সহিত একযোগে প্রবীণ ব্যক্তিরাও করালবদনা কালীর অনুচরবর্গের সহায় হইয়া মেদিনী প্রকম্পিত করে।

প্রবীণ প্রতিবেশী ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সেন, পরদিন তাঁহার বাটীতে সমাগত পল্লীবাসীগণকে বলেন, "পাড়ার রূপ দেখে কাল বড় আনন্দ হয়েছিল, অনেক দিন এমন দেখিনি"

শ্যামা পূজার পরেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ভ্রাতৃসোহাগিনীর—আয়োজনের ঘটা দেখে কে! তিন বৎসরের কন্যার হৃদয়ে জননী,

—বিজলী—

বাল্যে	কৈশোরে মাতৃক্রোড়ে	কৈশোরে	মাতৃমূর্ত্তিতে অর্ঘ্যহস্তে

"ভায়ের কপালে দিয়ে ফোঁটা
যমের দ্বারে পড়ল কাঁটা,"

মন্ত্রটী খোদিত করিয়া দেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসবে স্নেহময়ী ভগ্নী কায়মনোবাক্যে ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃত্রয়ের ললাটে চন্দন-বিন্দু লেপন করিয়া দিয়া তাহাদের প্রণাম করতঃ যখন গাত্রোত্থান করে তখন তাহার মুখে একটা সুস্পষ্ট জয়ের চিহ্ন দেদীপ্যমান। সত্যই যেন চিরদিনের মত যমের পথ রুদ্ধ করিয়া সহোদরদিগকে নিষ্কণ্টক করিয়া দিতে সে সমর্থ হইয়াছে। রাস ও দোলযাত্রা, পৌষ-পার্ব্বণ ও সরস্বতী পূজা—বাঙ্গালীর বারোমাসে তের পার্ব্বণের কোনটাই তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় ছিল না।

খেলা-ধূলা

"খেলা, খেলিতে আসা
খেলা খেলিব ব'লে,
খেলিতে, খেলিতে চিতে বাড়ে পিয়াসা—"

খেলা, বিজলী বেশই খেলে। মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া, হামা দিয়া, হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া, স্নেহময়ী জননীকে ক্রীড়ার নানা ভঙ্গিমা দেখাইয়া মায়ার সাগরে তাঁহাকে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। উত্থান-শক্তি রহিত জননীর অসহায় অবস্থায় পরমানন্দে ক্রীড়াশীলা নন্দিনী চক্ষের সম্মুখে যাহাকে পাইয়াছে, অব্যর্থ সন্ধানে তাহার প্রতি মায়াবান নিক্ষেপে

তাহাকে পাশাবদ্ধ করিয়া তাহার কী আনন্দ! নিত্য নূতন ক্রীড়া উদ্ভাবনে কী অনুরাগ!

পিতার স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর, বালিকার ক্রীড়াপদ্ধতি রূপান্তরিত হইতে থাকে। তাহার মনোহারিনী বিবিধ ক্রীড়ারঙ্গের অভিনবত্বে কত অপরিচিত শিশু তাহার অন্তরঙ্গ হইবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। দুইদিন খেলা-ধূলা করিয়া তাহার মায়ায় তাহারাও এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়ে যে তাহাদের মুক্তির কোন উপায় আর থাকে নাই।

খেলা ঘরের রন্ধন ভোজন করিয়া বা পুতুলের বিবাহ দিয়া বালিকার খেলার তালিকা শেষ হইত না। দশ জনের আগ্রহে এ সকল খেলায় সে যোগদান করিত বটে কিন্তু মন পড়িয়া থাকিত তাহার অন্য খেলা খেলিতে। তাহার পালিত পশু, পক্ষী ও স্বহস্ত রোপিত পুষ্পিত গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেল, যুঁই প্রভৃতির সহিত সাথীরা তাহার সকলেই পরিচিত। এত বড় যাহার সংসার সে কি তাহার সুবিমল আনন্দ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে? খেলা ঘরের আহারাদি লইয়া সে পশুপক্ষীদিগকে আহার করাইতে ছুটিয়া যাইত। আবার কখনো কখনো সাথীদিগকে সঙ্গে লইয়া তরু-লতার সন্নিকটে যাইয়া তাহাদিগের রূপ-গুণের প্রশংসায় সে মুখরা হইত। তাহাদের মূলদেশে জল সেচন ও শুষ্ক পত্র-পল্লব তাহাদের দেহ হইতে অপসারণ করা বালিকার ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য। মৃদু বায়ু হিল্লোলে যখন তাহারা দুলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিয়াছে বালিকার তখন আনন্দের আর সীমা থাকে নাই। আবেগভরে তাহাদের সহিত তখন তাহার কত কথা, কত রঙ্গ! বিজলী তাহার খেলার ভঙ্গিমায় দিন দিন সকলের প্রাণে খেলিবার পিপাসা বর্দ্ধিতই করিয়া দেয়।

খেলার উন্মাদনায় যখন অন্য সকলে বিভোর, তখন তাহাদের অজ্ঞাতসারে কখনো কখনো দল ভ্রষ্টা হইয়া দূরে একাকিনী পাষাণ

প্রতিমার ন্যায় বালিকা স্তিমিত নেত্রে দণ্ডায়মান থাকিত। দল-ভ্রষ্টার সন্ধানে আসিয়া তাহাকে সেই ভাবে দেখিয়া সঙ্গিনীদলের কী অভিমান! পলায়িতা বালিকা তখন তাহার নিঃসঙ্গ খেলায় ভঙ্গ দিয়া সহাস্যে তাহাদের সহিত পুনর্ম্মিলিতা হইয়া তাহাদের মনোমত খেলায় যোগদান করিয়াছে।

বিজলীর জনক-জননীকেও তাহার সহিত খেলা করিতে হইত। সহোদরবর্গের ত কথাই নাই। শয়নে, উপবেশনে, কথোপকথন সময়ে, আহার কালে বালিকার বিচিত্র ক্রীড়াকৌতুকে গৃহবাস আনন্দের তরঙ্গে প্রবাহিত! বালক বয়সে মাতৃহীন ও তাহার কিছু পরেই পিতৃহীন হওয়ায় তাহার জনকের প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। নির্ঝরিণীর ন্যায় বিজলী তাহা রসসিক্ত করে।

পিতামাতার মৃন্ময়-মূর্ত্তি গঠন করিয়া কন্যা সেই প্রকার শিল্পকার্য্য অনুশীলন করিতে উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। আর তাহাকে পায় কে? মাটীর তাল মাখিয়া নানা দ্রব্য গঠনে সে তৎপরা হয়। সঙ্গিনী ও সহোদর-বর্গের মূর্ত্তি নানা ছাঁদে গঠন করিয়া সকলকে হাসাইয়া তাহার নিজের খেলায় সে নিজেই হাসিয়া আকুল হইত। সকল সময়ে কিন্তু সে রঙ্গ লইয়াই থাকিত না। কখনো কখনো রাধা-শ্যামের যুগল-মূর্ত্তি গঠনের নিমিত্ত সে উপবিষ্টা—অনন্যমনা হইয়া সেই মূর্ত্তি প্রাণময় করিয়া গড়িয়া তুলিতে তাহার বিপুল উদ্যম। মূর্ত্তিটী গড়িয়া তাহার পানে চাহিয়া সে তাহা ভাঙ্গিয়াছে, গড়িয়াছে, আবার ভাঙ্গিয়াছে, আবার গড়িয়াছে, প্রাণপণ করিয়া গড়িয়াও যেন তাহার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

সাত আট বৎসর পর্য্যন্ত বালিকার খেলা-ধূলা এই ভাবেই চলে। তাহার আগ্রহে তাহার ভাণ্ডার নানাবিধ ক্রীড়নক, পুত্তলিকা ও দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হয়। তন্মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম দ্রব্যাদি

বালিকা সময়ে সময়ে অকাতরে দান করিয়া বসিয়াছে। পিতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কন্যা নীরবে ছল ছল নয়নে দণ্ডায়মান থাকিত, সুতরাং কারণ আর নিরূপিত হয় নাই। ইহা কি খেলা ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্ব্বাভাষ? ক্রমে বিজলীর শ্রেষ্ঠ খেলা হয়—শিশুর সমাদর, সেবা ও যত্ন। তাহাদের বক্ষে ধারণ করিয়া প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইয়াছে; তাহাতে তাহার কোনো ক্লান্তি নাই।

এই সময়ে তাহার পিতৃগৃহে রামায়ণ গান হয়। তাহা শুনিয়া অবধি খেলার সময় গুণগুণ করিয়া রাম নাম কীর্ত্তন করা বালিকার খেলার আর একটী অঙ্গ হয়। তাহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার এই সুযোগ তাহার জননী পরিত্যাগ করেন নাই। ইহার অল্পকাল পরে বিজলী কোন নাট্যালয়ে অভিনয় দেখিয়া আসিয়া "অভিনয়" খেলা করে। 'অভিনয়ে' গানের বাহুল্যই থাকিত—তাহার অধিকাংশ আবার কৃষ্ণ-সঙ্গীত।

সঙ্গিনীদিগকে লইয়া তাহার অন্য এক খেলা—তাহাদিগকে সীবন শিল্পাদি শিক্ষা দান করা। গুরু হইয়া সে যাহা জানিত সকলই তাহাদিগকে শিখাইত—সরল অন্তঃকরণে। তাহার হাতের কাজ উচ্চাঙ্গের শিল্প বলিয়া পরিগণিত হয়। লোকে বলিত, "ঠিক্ যেন মেমের তৈরি।"

অতি অল্প বয়স হইতেই পিতৃপুরুষগণের কাহিনী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সে আগ্রহ প্রকাশ করে। পিতার নিকট এই সকল শ্রবণ করা ক্রমে বালিকার নিয়মের মধ্যে হইয়া পড়ে। তাঁহাদের গৌরব কাহিনী শ্রবণে তাহার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইত। দশরথ বসু হইতে সকলের নাম তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। মোগল ও পাঠান রাজত্ব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রিটিশ শাসনকাল পর্য্যন্ত বংশের কোন্ পুরুষ, রাজ সরকারে কোন্ মর্য্যাদা লাভ করেন, সর্ব্বাধিকারী পদবী কথন, কেমন করিয়া অর্জ্জিত হয়—

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বালিকা সকল তথ্যই সংগ্রহ করে। পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের কোনো এক প্রাচীর নির্ম্মাণের ব্যয় যে তাহারই পূর্ব্ব-পুরুষ বহন করেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহার বংশ গর্ব্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

প্রপিতামহ যদুনাথ সামান্য মাত্র অর্থ লইয়া ভারতের তীর্থে তীর্থে কি ভাবে পরিভ্রমণ করেন, সে সকল কথা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত তাঁহার "তীর্থভ্রমণ" হইতে পাঠক পাঠিকা সবিশেষ অবগত হইবেন। প্রপিতামহের সেই আলেখ্য বিজলীর হৃদয়ে এক মধুর-রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। কুলদেবতা ৺শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর লীলা-কাহিনী ও শ্রীপাঠ খানাকুলের পুণ্য-কথা শ্রবণে পিতৃপুরুষদিগের সেই কীর্ত্তি-ভূমির ধূলি-কণা অঙ্গে লেপন করিয়া খেলা করিবার বাসনা বালিকার হৃদয়ে বলবতী হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে পিতামহের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সাহসিকতার পরিচয় ও কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক তাঁহাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের মর্য্যাদা দান, বিদ্রোহীজ্ঞানে নিরপরাধ বরসমেত বরযাত্রীদিগের কোর্টমার্সালের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ পিতামহের তৎপরতায় রহিত হওন, বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক নিশ্চিৎ হত্যা হইতে পিতামহকে প্রভুভক্ত ভূপাল সিংহের রক্ষা ইত্যাদি কাহিনী বিজলী শ্রবণ করিয়া সে তাহার স্বর্গগত পিতামহের নাম জপমালা করে। তাঁহার একখানি আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার জননীকে সে বলে, "মা এই ফটোখানার জন্যে কার্পেটে ফ্রেম্ বুনে দাও, নামও লিখে দাও।" জননী বলেন, "আমি কেন তুমিই কর না।" সে ব্যগ্র ভাবে বলে, "না, না, খুব ভাল ক'রে করতে হবে; তুমি করে দাও মা।" কন্যার ইচ্ছামতই কার্য্য হয়। কার্পেটে লিখিত হয়:—

বিজলী

Brigadier-General

***Rai Bahadhur Dr. Soorjee Coomar Surbaudhicaury,**

G. M. C. B, F. C. U,

First Indian President, Faculty of Medicine,

Calcutta University.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিতামহের পদমর্য্যাদা, ডাক্তার হেয়ারের সভাপতিত্বে মেডিকেল্ কংগ্রেসে তাঁহার সহকারী সভাপতিত্ব প্রভৃতি সকল তথ্যই তাহার জ্ঞাত, কিন্তু 'সহ' পদটা তাহার স্মৃতিপূজার নৈবিদ্যের উপকরণ যোগ্য সে মনে করে নাই। আলোক-চিত্র সহ এই চারু শিল্প 'ফ্রেমে' আবদ্ধ হইয়া তাহার কক্ষ-গাত্র শোভিত করিলে বিজলীর নানা খেলার মধ্যে আর একটী খেলা বিশেষ স্থান অধিকার করে। ধূপ-ধূনা গুগ্গুল্ ও পুষ্প-চন্দনে সেই চিত্রের নিত্য অর্চ্চনা না করিলে তাহার দৈনিক-খেলার তালিকা সম্পূর্ণ হইত না। কখনো কখনো পিতার নিকট ছুটিয়া আসিয়া গ্রীবা হেলাইয়া সে বলিত, "আচ্ছা বাবা, তোমার বাবার তদারক তোমরা করবে—আমার কি দায়?" কখনো বা সঙ্গিনীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া চিত্র সম্মুখে উপবেশন করতঃ আবাহন-সঙ্গীতে সেই চিত্র যেন প্রাণময় করিয়া তুলিতে সে প্রয়াস পাইয়াছে। বালিকা কখন্ যে কি খেলা খেলে তাহার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

*কার্পেটে লিখিত নামের বানান-ই স্বর্গীয় পিতৃদেব লিখিতেন—গ্রন্থকার।

বাল্যশিক্ষা

বিজলী যখন পাঁচবৎসরের তাহার জনকজননী তাহাকে নৈতিক ও সাধারণ শিক্ষা প্রদান করিতে যাইয়া দেখেন যে সে তাহার শিক্ষা নিজেই আরম্ভ করিয়া দিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আত্ম-পর তখন তাহার আর ভেদ নাই। দাসদাসী তাহার আত্মীয় ও আত্মীয়া। তাহার বন্ধুবান্ধবগণ তাহার প্রাণ-তুল্য। গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, পাখী—কাহাকেও আদর করিতেছে, কাহারও সহিত বা সোহাগভরে কথা কহিতেছে। পরদুঃখে সে বিগলিতা, দেবদ্বিজে তাহার অনন্য-সাধারণ ভক্তি ও বিশ্বাস। তাহার নিকটে দ্বন্দ্ব, কোলাহল, মিথ্যা-প্রবঞ্চনার রেখাটিও ফুটিয়া উঠিবার উপায় নাই। অনাবিল আনন্দ ও স্মিত-হাস্য বালিকার নয়নে বদনে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান। যে জলের মত স্বচ্ছ, ফুলের মত স্নিগ্ধ, আকাশের মত উদার তাহাকে কে শিক্ষা দিবে, কি শিক্ষা দিবে?

কন্যার পিতা তাহার মানসিক বৃত্তির পরিচয়ে প্রীত হইয়া তাহার পাঠাদি বিষয়ে মনোযোগী এবং তাহার জননী তাহাকে শিল্পাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানে যত্নবতী হ'ন। অক্ষরপরিচয় ও প্রাথমিক পাঠাদি সম্পন্ন হওয়ায় জননী কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের আয়োজন করেন। বিজলী কিন্তু তাহাতে বাধা প্রদান করে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে সে অসম্মত হয়। পিতা স্বয়ং বহু চেষ্টা করিয়াও কন্যার মতের পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন নাই। তাহার একান্ত অনিচ্ছাহেতু তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয় নাই। জনকজননীই বালিকার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। মামুলী পাঠ্যপুস্তকাদি বালিকার স্কন্ধে না চাপাইয়া রামায়ণ মহাভারতকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হ'ন। ফল আশাতিরিক্ত সন্তোষজনক হয়।

বিজলী

রামায়ণ পড়িতে পড়িতে, রামরাজ্য কি তাহা সম্যক্ প্রনিধান করিতে পারিলেও নিরপরাধিনী সীতার লাঞ্ছনার মূল্যে তাহার সৃষ্টির মাধুর্য্য উপলব্ধি করা বালিকার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। বালিকার মতে, সীতা বর্জ্জনে জনক-নন্দিনীর স্বামীভক্তির দৃষ্টান্তই প্রোজ্জ্বল। বিনা প্রতিবাদে স্বামীর আদেশ পালন করেন তিনি, কেবল পতিদেবতার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে—তাঁহাকে রামরাজ্য স্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতে।

মন্থরার চরিত্র বিশ্লেষণে, বিজলী স্নেহবৎসলা ধাত্রীর দোষের অপেক্ষা গুণেরই অধিকতর পরিচয় প্রাপ্ত হয়। পালিত পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়াই তাহার মনে হয়। সুতরাং মন্থরার প্রতি শ্লেষ বিদ্রূপ ও কটূক্তি পাঠে সে তাহার প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করে। কৈকেয়ীকে সে কিন্তু ক্ষমা করিতে পারে নাই। রাজার নন্দিনী, রাজরাণী হইয়া রাম-নির্ব্বাসনে তাঁহার নির্ব্বন্ধ অতি হীন পরিচয়ের চিহ্নই প্রদান করে। সত্য বটে দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ-সর্ত্তে ও পরে সত্যাবদ্ধ ছিলেন। স্বামীকে তাহা হইতে মুক্তি প্রদান, কৈকেয়ী অনায়াসেই করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া কুল-তিলক পুত্রের নির্ব্বাসনের জন্য রমণীর কি কঠোর প্রয়াস! এই রমণী যে ভরতের মত পুত্রের জননী ইহা ভাবিয়া বালিকা আশ্চর্য্যান্বিতা হয়, আর দশরথের মৃত্যুর বিবরণ পাঠে অধীরা হইয়া পড়ে।

সমগ্র রামায়ণের মধ্যে রাম-দাস হনুমানের চরিত্র বিজলীর নিকট আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভক্তি, বিশ্বাস ও স্বার্থত্যাগে এমন মহীয়ান চরিত্র সপ্তকাণ্ডের ভিতরে আর কোথাও সে দেখিতে পায় নাই। লক্ষ্মণ ও ভরতের মধ্যে ভ্রাতৃবৎসলতায় ভরতকেই সে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। বিভীষণ তাহার নিকট অননুমেয়।

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পঠিত হয়। যুধিষ্ঠিরের অশ্বত্থামা সংবাদে সে ঈষৎ হাস্য করে। ভীষ্মের গরীয়ান চিত্রদর্শনে গৌরবে সে পুলকিতা হয়। শকুনির বীভৎস প্রতিহিংসায় অধর্ম্মাচারী কুরু-কুলের প্রতিও সমবেদনায় তাহার প্রাণ ভরিয়া যায়। পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রের লৌহ-ভীম চূর্ণ স্মরণে অশ্রু-ধারা রোধ করিতে সে পারে নাই। বাসুদেবের সকল কার্য্যপ্রণালী কখনোই সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতে বালিকা কিছুতেই সক্ষম হয় নাই। ছলনা যদি নিমেষের জন্যও স্বর্গারোহণের অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের অভ্যুত্থান সাধনে পদে পদে কপটতা অবলম্বন, শ্রীভগবানের পক্ষেও ভক্তের প্রাণে বিষম বেদনার সৃষ্টি করাই স্বাভাবিক।

বালিকা মহাভারতাদি পাঠকালে এইরূপ প্রশ্নই বারবার করে। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় ছলনা কপটতার সহায়তা, আদর্শকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে বলিয়াই তাহার ধারণা ও বিশ্বাস।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও আধুনিক মহাপুরুষ ও সাধ্বী রমণীগণের জীবনালোচনাও বালিকার পাঠের অন্তর্ভুক্ত হয়। হিন্দু-যুগের রাজত্ব-প্রণালী ও তাহার দোষ-গুণ, মোগল-পাঠানের রাজত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব ও তাহার ফলাফল, মহারাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ও পতন তাহার পাঠ পদ্ধতিতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে ইতিহাস পাঠে অননুরাগী তাহার কোনো ভ্রাতা সেই অভিনব পাঠ-প্রথা অবলম্বনে ইতিহাস পাঠে প্রভূত আনন্দ লাভ করে।

পৌরাণিক ভূগোল তত্ত্বের সহিত মানচিত্রে দৃষ্ট নদ-নদী প্রভৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা করা—বিজলীর ভূগোল পাঠের বিশেষত্ব। খণা ও লীলাবতীর কাহিনী অঙ্কশাস্ত্রে তাহার অনুরাগ বর্দ্ধিত করে। প্রসন্নকুমারের পাটীগণিত ও বীজগণিত তাহার অনুরাগের মূলে জল সেচন করে।

পাশ্চাত্য আদর্শের পরিবর্ত্তে প্রাচ্য আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালীই বালিকার উপযোগী হয়। জননী যখন তাহাকে পাশ্চাত্য প্রথায় পরিচালিত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে উৎসাহ প্রদর্শন করেন তাহা তাহার সংস্কারের বিরোধী হওয়াতেই সে তখন বিদ্রোহিনী হইয়া উঠে। রামায়ণ ও মহাভারত অধ্যয়ন কালে বালিকা নানাভাবে এই মতের পোষকতাই করে।

পৌরাণিক আখ্যান সকল শিশু হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার মানসে বিজলীর পিতা নিজ-গৃহে রামায়ণ গানের ব্যবস্থা করেন। তাহার বয়স তখন সাত বৎসর। গায়কের গানে আকৃষ্টা হইয়া তদ্গত চিত্তে বিজলী তাহা শ্রবণ করিত। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষা করিবার সাধ তাহার হয়। কালে সুকণ্ঠের নিমিত্ত বিশেষ খ্যাতি সে অর্জ্জন করে। ভগবন্নাম কীর্ত্তনের বাসনা তাহার সঙ্গীত-পটুতার মূল কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন।

মহাভারত সাঙ্গ করিতে কিঞ্চিদূর্দ্ধ চারিবৎসর লাগে। ইতিমধ্যে বিজলীর সহোদরেরা তাহাকে কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিতে থাকে। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য প্রদর্শনী মিউজিয়ম্, বোটানিক্যাল্ গার্ডেন্ পরিদর্শনকালে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের পথ প্রসারিত করিয়া লইতে বিজলী বিস্মৃত হয় নাই। ক্রাইষ্টের জীবনী পাঠে সে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও চলচ্চিত্রে সেই প্রেমাবতারের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাসকল দর্শন করিয়া শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক নমিত হয়। গীতা পাঠেও তাহার যেমন আনন্দ, *Imitation of Christ*এর আলোচনাতেও পরে সে তদ্রূপ যত্নবতী হয়।

সংস্কৃত অক্ষরের সহিত পরিচয় না থাকিলেও, গীতা পাঠে বা অর্থ গ্রহণে তাহার কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। গীতার আবৃত্তি শ্রবণে সংস্কৃত

কলেজের অনেক মেধাবী ছাত্রও তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। ভক্তি যাহার হৃদয়ের কেন্দ্র, বিশ্বাস যাহার মূলমন্ত্র, প্রীতি সরলতা যাহার অলঙ্কার, সাহিত্য, ব্যাকরণ আপনি তাহার দ্বারস্থ হয়। নিরক্ষর পরমহংস দেবের শ্রীমুখের বাণী মহামহোপাধ্যায়দিগের মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছে। দস্যু রত্নাকরের কণ্ঠে ভারতী স্বয়ং আরোহণ করিয়াছেন।

জননীর যত্নে জীবন কার্য্যাদি শিক্ষাও বালিকার দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। শিক্ষয়িত্রী তাহাতে পরিতোষ লাভ করিলে বালিকা নিজ শ্রম সার্থক জ্ঞান করিত।

শয্যাবাসের অমলিনতা ও আবাসস্থান প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতা রক্ষা-করণে বালিকাকে কোনোরূপ শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয় নাই। অমল ধবল মল্লিকার অঙ্গে 'পাউডার' লেপনের আবশ্যকতা আছে কি ?

গৃহকর্ম্মে ও পূজার্চ্চনায়

আদরে আদরে বর্দ্ধিত হইলেও বিজলী 'গোবর' হইয়া যায় নাই। "রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তা শোভা পায়"; দুলালীর অসংযত আচার অভিভাবকগণের দোষে কোথাও কোথাও দেখা যায় বটে। আত্মসংযত রাজনন্দিনীর কিন্তু যথেচ্ছাচার করিবার কল্পনাও জন্মগত ভাবের বিরোধী। রাজার নন্দিনী সে, অযাচিত সমাদরের মূল্য সে তো অনবগত নহে। দানের মর্য্যাদা হানি করা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ? সেই সমাদরের মূল্যজ্ঞানই যে তাহাকে কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যাইবে।

বিজলীর গুণাবলীর ক্রমবিকাশ আপনা হইতেই হইতে থাকে। শৈশবে জননীর পাছু পাছু থাকিয়া গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা করিতে সে কিরূপ ব্যগ্র হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। একাগ্রতাহেতু কার্য্যকুশলতা তাহার

শীঘ্রই অনায়াসলভ্য হয় এবং সংসারে তাঁহার দোসর হইয়া নিজ কার্য্য-দক্ষতার বিশিষ্ট পরিচয় প্রদানে সে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে। তাহার ঐকান্তিকতা ও দক্ষতায় প্রতিবেশিনীবর্গেরও সস্নেহ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়।

পাঠাধ্যয়ন, গীত-বাদ্য ও সূচি-শিল্পাদি শিক্ষা করিয়াও সাংসারিক কার্য্য করিতে বিজলীর অনবসর কখনো ঘটে নাই। যথাসময়ে সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাণ্ডারীর কার্য্য, তাম্বুল রচনা, পাকশাকের আয়োজন ও পাককার্য্যে সহায়তা করণ, আহার পরিচ্ছদ ও শয্যাদির তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্যে জননীর শ্রম লাঘব করিতে সে সদাই বদ্ধপরিকর। সে সকল বিষয়ে পিতার নিষেধ বা জননীর বিরক্তি উপেক্ষা করিয়া মিনতিপূর্ণ নয়নে তাহার সংকল্প পূরণার্থে সে সচেষ্টিতা হয়। ফলে তাহার সাতবৎসর বয়সেই সংসারের অধিকাংশ কার্য্য আপন স্কন্ধে স্থাপন করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহা বহন করিবার শক্তি সে অর্জ্জন করে। সকল বিষয়েই তাহার শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও তৎপরতার সীমা ছিল না। নীরবে সে কার্য্য করিয়া যাইত।

বিজলী যখন দশ বৎসরের, তখন রন্ধন কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থালীর এমন কোনো কার্য্যই ছিল না যাহা তাহার আয়ত্তাধীন হয় নাই দশ-পনেরজন হটাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেও স্বহস্তে রন্ধনাদি করাইয়া তাহাদিগকে আহার সে করাইয়াছে। কন্যা-গৌরবে জননী, তাঁহার আহ্লাদ দমন করিতে না পারিয়া কখনো কখনো তৃতীয় ব্যক্তির নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিলে, লজ্জানত মুখে বালিকা অবস্থান করিত। শ্রোতা, প্রস্থান করিবামাত্র কন্যা জননীকে বলিয়াছে, "সকলের সামনে তুমি অত কথা কও কেন বলত ?"

সূর্য্যোদয়ে—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

শৈশবে জননীর নিত্যপূজা দেখিয়া শিশুকন্যা পূজার যে অনুকরণ করিত এবং পূজা পার্ব্বনাদির সময়ে বালিকার যে উন্মাদনা প্রকাশ পাইত তাহা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মে অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার পথে তাহার বিশেষ সহায় হয়। জননীর নিত্য পূজার জন্য সকল আয়োজন করা বালিকার নিত্যকর্ম্ম হইয়া পড়ে। শুদ্ধবেশে, প্রফুল্লহৃদয়ে, পুষ্পপত্রাদি সজ্জিত করিতে বসিয়া সজ্জাকারিণী হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি তাহাতে মিশাইয়া দেবতার পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া দিত। শিবপূজা করিতে বসিয়া তন্ময়তার তাহার সীমা থাকিত না। নিরাড়ম্বর দেবতার নিরাড়ম্বর পূজা। তাঁহার অর্চ্চনায় পূজারিণীর নিষ্ঠা, ভক্তি কিন্তু অসীম! শঙ্খধ্বনি করিয়া সন্ধ্যা-দীপ দান বালিকা তাহারই কার্য্যের মধ্যে করিয়া লয়।

বিজলীর দুর্গা ও কালীপূজার কথা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পূজায় তাহার সেই উন্মাদনা সকলেই প্রীতিভরে উপভোগ করেন। কোনো আত্মীয়া কিন্তু কথাচ্ছলে একদিন তাহার উদ্দেশে বলেন যে বৈষ্ণবের ঘরে শক্তি-পূজার খেলাও শোভনীয় নহে। পরবৎসরে মহাপূজার কিছু পূর্ব্বে সে পিতাকে বলে, "হাঁ বাবা তুমি যে বল মা আমার পরম বৈষ্ণবী।" ছয় বৎসরের কন্যার সেই প্রশ্নে পিতা বিস্ফারিত নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকেন। বালিকার এ কি প্রশ্ন! কন্যা পুনরায় প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন যে বৈষ্ণবদিগের ইহাই তো সর্ব্ববাদীসম্মত নীতি। বালিকার মুখ-কমল তাহাতে অনির্ব্বচনীয় শান্তির আভায় রঞ্জিত হয়। ভবিষ্যতে মৃণ্ময়ী-প্রতিমার সাহায্যে শক্তি-পূজার সাধ মিটাইবার কোন আগ্রহ তাহার প্রকাশিত হয় নাই! সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া দুর্গা ও কালীপূজার কয়দিন প্রাণোন্মাদিনী সুরলহরীতে জগদীশ্বরীকে প্রীত করিবার আয়াসে বিজলী আত্মহারা হইত। পূজার যে অভিনব পদ্ধতি

বালিকা অবলম্বন করে তাহাতে শক্তি-পূজা-বাদিনী সেই আত্মীয়াটীও বিভোর হইয়া যায়। মহাশক্তির আরাধনায় তাহার অপূর্ব্ব সফলতা ইহাতেই অধিকতর পরিস্ফুট।

পিতৃবংশের সরস্বতী পূজার ভার যখন বিজলীর পিতার স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার বয়স কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর। মহানন্দে জননীর সহিত পূজার আয়োজনে সে মত্ত হয়। প্রতিমার বেশ-করণ তাহার জননী স্বহস্তেই করেন। পরবৎসর হইতে সে কার্য্যের ভার বিজলী গ্রহণ করে এবং জননীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতিবৎসর প্রতিমার সাজ সজ্জায় তাহার অভিনব শিল্প-কলা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সমর্থা হয়। ধ্যান-সঙ্গত মনোরম বেশভূষায় সজ্জিতা প্রতিমার পানে চাহিয়া প্রতিবেশীবর্গ শিল্পীর অজস্র প্রশংসাবাদে মুক্তকণ্ঠ হইয়াছেন, আর বালিকা তাহার ধ্যানের প্রতিমাকে মনের মতন করিয়া সাজাইতে পারিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতে বালিকার পিতৃবংশে সরস্বতী পূজার কথা দেশ-বিশ্রুত। বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাণীর বহু বরপুত্র সে পূজায় যোগদান করিতেন। পিতৃবংশের সেই পূজার মর্য্যাদা পিতার সময়েও অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিজলীর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তাহার উৎসাহে তাহার পিতা পূজা উপলক্ষে যথাসাধ্য সমারোহের ব্যবস্থা করেন। বাহ্যিক সমারোহের ব্যবস্থায় সে প্রীতা হইলেও পূজার জন্য আবশ্যকীয় উপকরণাদির আয়োজন করিতে এবং যথাসময়ে পূজাকার্য্য যথাবিধি সম্পাদন করাইতে তাহার নিষ্ঠা সমধিক প্রতীয়মান হয়। ব্রাহ্মণ যখন প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজায় আসীন, বাসন্তীবস্ত্র-পরিহিতা অদূরে উপবিষ্টা বালিকার নির্ণিমেষলোচন তখন স্মিত-বদনা ভগবতী ভারতীর হসিত-দৃষ্টির প্রতি ন্যস্ত। দুই শক্তি যেন পরস্পরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্তা;

পূজা-কক্ষ ধূপ, ধুনা, পুষ্প, চন্দনের সৌরভে আমোদিত। শঙ্খ-ঘণ্টারবে গৃহ মুখরিত— বালিকার কোনো কিছুতে সাড়া নাই। তদ্গতচিত্তে দেবীর মুখপানে চাহিয়া সে সমাধিস্থ! ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশমত "বিদ্যাং দেহি, যশো দেহি" বলিয়া সমবেত বালক বালিকারা যখন দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে উচ্চকণ্ঠ, বিজলী তখন গললগ্নীকৃতবাসে দেবী প্রণাম করিয়া সহাস্যবদনে গাত্রোত্থান করিয়াছে।

পূজাদি ব্যাপারে তন্ময়তা বিজলীর দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহার পঞ্চম জ্যেষ্ঠভ্রাত-পত্নী ও মাতামহীর ব্রতাদি উপলক্ষে সমবেতা বালিকা-বৃন্দের গালগল্প, পূজার সময়ে তাহাকে তাহাদের চক্রে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। যথাসময়ে পূজার স্থানে ছুটিয়া গিয়া ব্রতকর্ম্মাদি দর্শনে সে অপার আনন্দ লাভ করিত। ধূপ ধুনার সৌরভে একটা আবেশ ভাব সে কখনই অতিক্রম করিতে পারিত না।

কর্ত্তব্য পালনে

স্নেহ, প্রীতি ও মমতাময়ী বিজলী কর্ত্তব্যপালনের সময়ে কঠোরাদপি কঠোর যে হইতে পারিত তাহার আভাষ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। পরুষ বাক্য বা ব্যবহারে কাহারও প্রাণে ব্যথা দেওয়া তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সেরূপ কার্য্য কখনো তাহাদ্বারা হয় নাই, যত অপরাধই কেহ করুক না কেন! অপরাধীর সম্মুখে অপরাধের উল্লেখ আদৌ সে করিত না। তাহার সেই চির-প্রফুল্ল নয়নে বেদনার কালিমা ফুটিয়া উঠিত মাত্র, তাহাতেই অপরাধীর লজ্জার আর পরিসীমা থাকিত না।

অপ্রিয় সত্যও বিজলীর বলিবার ভঙ্গিমায় শ্রুতিমধুর! যাহার উদ্দেশে তাহা বলা, সেও তাহাতে না হাসিয়া থাকিতে পারিত না।

বিজলী

বিজলীর চিত্ত স্থৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতি ও সৎসাহস সকল সময়েই কর্ত্তব্য-পালনে তাহার সহায়তা করে। তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

ছয়বৎসরের বিজলী দীপালীর সন্ধ্যায় বিজয়কে সঙ্গে করিয়া পিতার নিকটে আসে। ভগ্ন কাচ-স্তূপের উপর পতিত হইয়া বিষম আঘাত প্রাপ্তি হেতু বিজয়ের পদতল হইতে তখন ভীষণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। চিকিৎসকের সাহায্যে সেই রক্তস্রোত বন্ধ করিতে হয়! তাহা করিতে বিলম্ব হইলে বালকের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইত। আঘাত-প্রাপ্তির কথা গোপন রাখিবার জন্য ভগ্নীর সাধ্যসাধনা বালক করে। নির্ম্মম সহোদরা কিন্তু তাহাতে না ভুলিয়া বাষ্পাকুলনয়নে পিতার নিকটে তাহাকে উপস্থিত করিয়া দেয়।

ভৃত্য সোমরের পদদ্বয় একদিন উষ্ণজলে দগ্ধীভূত হয়। গৃহস্বামী তখন বাটীতে ছিলেন না। সোমরের চীৎকারে বিজলী তাহার কাছে দৌড়াইয়া যায় এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া ত্বরিদগতিতে গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে গোময় সংগ্রহ করতঃ অগ্নিতাপে তাহা উত্তপ্ত করিয়া তাহারই প্রলেপ আহতের পদদ্বয়ে প্রদান করে। তাহাতেই দগ্ধকারণ-যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। এই ঘটনা ঘটে বিজলী যখন আট বৎসরের।

ইহার ২।১ বৎসর পরে বিজলীর জননী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্তা হইয়া শয্যাশায়িনী হ'ন। চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করেন। অপগণ্ড বালক বালিকাদের কে তখন রক্ষণাবেক্ষণ করে, কে সাংসারিক কার্য্য পরিদর্শন করে, কেইবা রোগিনীর সেবা শুশ্রূষা করে—বিষম সমস্যা! সকল সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়া দেয়—বালিকা বিজলী। কখনো জননীর শিয়রে বসিয়া প্রাণপণ শক্তিতে সে তাঁহার সেবা করিয়াছে এবং পরক্ষণেই সাংসারিক সকল কার্য্যের আয়োজন ক্ষিপ্রহস্তে করিয়া দিয়াছে।

জননীর কঠিন পীড়া হেতু বালিকার বিষন্নতার সীমা থাকে নাই, কিন্তু সে কারণে কর্ত্তব্যে অবহেলা তাহার নিমেষের জন্যও ঘটিত না।

বিজলীর জননী ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দীর চিকিৎসাধীনে ছিলেন। বিজলীর কার্য্যকলাপ দেখিবার স্থযোগ স্থতরাং তাঁহার অল্পাধিক ঘটে। একদৃষ্টে নন্দীমহাশয় একদিন কাহার প্রতি চাহিয়া আছেন দেখিয়া গৃহস্বামী সহাস্যে তাঁহাকে বলেন, "বিজলী যে কত বড় দুষ্টু সেটা পরখ্ ক'রে দেখ্ছেন বুঝি?" তিনিও হাসিয়া বলেন, "হঁ্যা দেখ্ছি এমন দুষ্টু মেয়ে এখনও বাংলায় আসে।"

কয়েক বৎসর পরে মাতামহীর পীড়ার সময়ে, জননীর সহিত মাতুলালয়ে থাকিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সংসারের প্রতি কার্য্যের তত্ত্বাবধান বা সম্পাদনের ভার বিজলী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্তা জননীকে সাহায্য করিতেও কন্যা সতত যত্নশীলা। মাতামহীর পীড়ার রূপ উত্তরোত্তর বক্রভাব ধারণ করে। তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র চিত্তদৌর্ব্বল্য বিজলীর প্রকাশিত হয় নাই। কর্ত্তব্যের অনুশাসনে কর্ম্মে শিথিলতা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার আসে নাই।

এই সময়েই বিজলীর 'আশা মাসীর' শুভ বিবাহ হয়। বিবাহবাসরে এমনভাবে তাহার ন্যায্যস্থান অধিকার করিয়া সে বসে যেন আধি-ব্যাধি বাটীর ত্রিসীমার মধ্যেও নাই। দীর্ঘ অষ্টাদশ মাস রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সেই বিবাহের অল্পদিন পরেই মাতামহী দেহ ত্যাগ করেন। বিজলী তাঁহার একমাত্র দৌহিত্রী বড় সাধের, বড় আদরের। বালিকা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে "দিদামণি" তাহাকে এমনি করিয়া ফাঁকিদিয়া পালাইয়া যাইবে। তাঁহার প্রাণহীন দেহের উপর পড়িয়া সে কাঁদিয়া আকুল হয়। মাতৃ-বিয়োগ শোকে তাহার নিজ জননীর কাতরতায় কিন্তু

শোকাতুরা বালিকা শোক 'ঠেলিয়া' তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে এবং মাতামহ ও মাতুলদিগকে 'দেখাশুনা' করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কোমলে কঠিনে বিজলীর তখন অপূর্ব্বমূর্ত্তি!

রাত্রিকালে গতিশীল ট্রেনে একজন চোর বিজলীর কণ্ঠ হইতে অলঙ্কার চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়ে। পুলিশের হস্তে অপরাধীর নিগ্রহের আর সীমা ছিল না। সকলেই তাহাকে প্রহার করিতেছে দেখিয়া বিজলী তাহার প্রতিবাদ করে। তাহাতে লজ্জিত হইয়া অনেকে তখন নিরস্ত হয়।

জামতাড়া হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য মধুপুরে যাইয়া, প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে সেই দেশীয় একজন স্ত্রীলোককে মূর্চ্ছিতা অবস্থায় বিজলী দেখিতে পায়। সে দিন হাটবার — মূর্চ্ছিতার চারিদিকে ভীড় জমিয়াছিল খুবই। অসুস্থাকে সাহায্য প্রদানে কিন্তু কাহারও কোনো চেষ্টাই ছিল না। কাতর নয়নে পিতার মুখপানে চাহিয়া বিজলী বলে, "একে মেরে ফেলবে এরা।" পিতা বলেন, "তাতো দেখ্‌ছি কিন্তু ট্রেন্‌ও যে এসে প'ড়ল।" পিতার হাত ধরিয়া কন্যা ব'লে "তা পড়ুক, শিগ্‌গির এর যা হয় কর" মূর্চ্ছিতাকে ছায়াযুক্তস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা, রেলের ডাক্তারকে সংবাদ প্রেরণ, দুগ্ধাদি সংগ্রহ ইত্যাদি করিতে সময় যথেষ্ট অতিবাহিত হয়। ট্রেন্‌ ধরিবার কোন আশাই থাকে না বিজলীর তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। অসুস্থাকে সুস্থা দেখিয়া তবে সে স্থান ত্যাগ করে। ষ্টেসনে আসিলে জানা যায় যে গাড়ী 'লেট্‌'— মধুপুরে পৌছিতে তখনও অনেক দেরী।

ভ্রাতৃ-সকাশে

তিন পুত্রের পর বিজলী জন্মগ্রহণ করিলে মাতামহী সংস্কার বশতঃ 'কাঁসি ভাঙ্গিয়া' এবং অন্যান্য তুক্‌-তাক্‌ করিয়া দৌহিত্রীর দৃষ্টি দোষের খণ্ডন করেন। কিন্তু কোন কোন জ্যোতিষ-ধুরন্ধর তাঁহার লৌহ সিন্দুকের পরিসর জ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত দোষ খণ্ডনার্থ তাঁহার ক্রিয়া-করণের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। তখন উপায় তাঁহারাই। কৃপা করিয়া উপায় করিয়া দিতে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হন। বহু রজতখণ্ডের বিনিময়ে কতিপয় কবচ দৌহিত্র ত্রয়কে ধারণ করাইতে বলিয়া এবং ভগ্নীর নিকট হইতে বালক-দিগকে দূরে রাখিবার উপদেশ দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন। উপদেশের প্রথমাংশ পালিত হইলেও দ্বিতীয়াংশ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। কারণ সহোদরেরা সহোদরাকে কিছুতেই ছাড়িয়া থাকিত না। 'বোনটি' ছিল তাহাদের নয়নের মণি, শান্তির আধার, গৃহের শোভা।

সহোদরার স্নেহের বন্ধনে ক্রমে সহোদরেরা তাহার মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে তাহা পালন করিতে যত্নবান হইত, আর স্নেহময়ী বিজলী প্রাণতুল্য সহোদরদিগের পায়ে কাঁটাটি ফুটিলেও তাহা তুলিয়া না দিয়া স্বস্তি পাইত না।

ভ্রাতাদের লইয়া একত্রে আহার, খেলা-ধূলা ও গল্প করিবার অভ্যাস শিশুকাল হইতেই বিজলীর হয়। তাহাদিগের সেবা ও পরিচর্য্যা স্বেচ্ছায় সে করিত। সকল বিষয়েই বালিকার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি! প্রাতে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিতে যাহাতে তাহাদের এতটুকুও বিলম্ব না হয় সেই জন্য প্রাতরাশের সকল আয়োজন পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত থাকিত। বিদ্যালয়ে

তাহাদের যাইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিজলীর নিশ্বাস ফেলিবার আর অবকাশ থাকিত না। পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার ছুটাছুটি তখন দেখে কে!

আহারাদির আয়োজন ও তত্ত্বাবধান জননী স্বয়ং করিতেন। সহোদরদিগের যাহার যাহা প্রিয় খাদ্য জননীকে তাহা পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়া মনের মত ব্যবস্থা বিজলী করাইয়া লইত।

পরীক্ষার সময়ে জননী তাহাদের "যাত্রা" করাইয়া দিলে জয়লক্ষ্মীর মত অগ্রগামিনী হইয়া প্রফুল্লবদনা সহোদরা বাটীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া তাহাদের জয়যাত্রা করাইয়া দিত। বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণের পর সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক লইয়া যখন তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে, কলরবের সহিত তাহাদিগকে পিতৃমাতৃ সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বিজলী বলিয়াছে, "দেখ বাবা, দেখ মা—ফাঁকি দিয়ে সব প্রাইজ্ই পেয়ে গেছে—আমি একজামিন্ করতুম তো প্রাইজ্ পাওয়াতুম্।" সহোদরদিগের জয়ে, জনকজননী ও সহোদরদিগকে লইয়াই তাহার এই উৎসব। অপরের নিকটে সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ সে করিত না। বিকাশচন্দ্রের প্রবেশিকা ও আই এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দৌহিত্রের সাফল্যে মাতামহী যখন সকলের নিকট সে কথার উল্লেখ করিতে থাকেন, বিজলী তাহার জননীকে বলে, "দিদামণি যেন কি, *Compete* বুঝি আর কেউ কখন করেনি—"

রন্ধন-বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া নিত্য ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদির কিছু কিছু স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া ভ্রাতাদিগকে আহার না করাইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। আহার করিতে করিতে সকলের কত হাসি কত গল্প! সেই সুযোগে কেহ যদি পাত্রস্থিত আহার্য্য দ্রব্যাদির যথাযথ সম্মান রক্ষা না করিয়া পলায়নের উপক্রম করিয়াছে, বালিকার সরোষ ইঙ্গিতে

অপরাধীর আসন ত্যাগের কল্পনাও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে—বিজলী যেন সকলের দিদি!

অল্পভাষিণী বিজলীর ভ্রাতৃবর্গের সমক্ষে কথার বিরাম থাকিত না। তাহাদের সহিত গল্প করিতে বসিলে গল্প আর তাহার ফুরাইত না। হাস্য, কৌতুক, ক্রীড়ায় তখন সে উন্মত্ত। শত দ্ব্যর্থের সৃষ্টি করিয়া ভ্রাতাদের 'ব্যভ্রম্' করিতে তাহার অপার আনন্দ। বিবাদের ভান করিয়া তাহাদিগের সহিত বিবাদ বাধাইতে তাহার অশেষ যত্ন। চারিজনে ঘোর বাক্-বিতণ্ডা! মুক্ত প্রাণের মুক্ত হাসির রোলে বাটী তখন প্রকম্পিত!

অগ্রজদিগকে "দাদা" বলিয়া সম্ভাষণ বিজলী কখনো করে নাই। শিশু-কালে জননীর দেখাদেখি "ছেলেরা" বলিয়াছে। আত্মীয় মহলে ইহা লইয়া হাস্য পরিহাস যথেষ্ট হইলেও সে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই। তাহার ১০।১১ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত ছেলেরা বলার অভ্যাস সে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। 'দাদা' না বলায় লোকে বলিত, "আদর দিয়ে মেয়েকে মাথায় তুলে দিয়েছে বাপ্ মা।" সে কথা শুনিয়া বিজলী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত। অগ্রজদিগকে দাদা না বলিলে যে তাহাদিগের অসম্ভ্রম করা হয়, একথা তাহাকে শিখাইলেও সে শিখিত না—ইঙ্গিতে সহোদর-দিগকে বুঝাইয়া দিত, "ব'য়ে গেছে।" 'ব'য়ে' তাহার যাইত না, কিন্তু স্নেহ, যত্ন ও সেবায় তাহাদিগের জন্য প্রাণ তাহার পাত করিতে।

বিকাশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন একদিন 'ক্লাসে' অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। এই দুঃসংবাদে গৃহস্থ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় এবং গৃহস্বামী বালকাধম হইয়া পড়েন। বিজলী ব্যাকুল পিতার সন্নিকটস্থ হইয়া বলে "বাবা কোরছ কি? বিকাশকে আন্‌তে হবে না?" সেই তীব্র অনুযোগে পিতার চৈতন্য হয়। সহোদর গৃহে আনীত হইলে তাহার মুমূর্ষু অবস্থা

দেখিয়া আত্মীয়বর্গের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত—অশ্রু রুদ্ধ করতঃ দ্বাদশ বর্ষীয়া বিজলী তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়। ভ্রাতার সেবার ভার সে গ্রহন করে। অক্লান্ত পরিশ্রমে, অসীম উৎসাহে প্রহরের পর প্রহর রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা, স্নেহময়ী সেবিকার মহিমময়ী দীপ্তিতে ঝলসিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হয়।

দৃষ্টি-দোষ সম্পন্না বালিকা সহোদরের প্রতি এইরূপ অশুভ-দৃষ্টিপাতই পুনরায় করে। তাহার মাতামহীর ইহা দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। কিম্বা কে বলিতে পারে যে স্বর্গ হইতে দৌহিত্রীর কীর্ত্তি-কলাপ দর্শনে তিনি আনন্দোৎফুল্লা হ'ন নাই।

গ্রহাচার্য্য দত্ত পূর্ব্বকথিত 'রক্ষাকবচ' গুলির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অতিশীঘ্র লুপ্ত হয়। প্রাণসম সহোদরদিগের অহর্নিশি শুভ কামনায় নিজ সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্নেহময়ী ভগ্নীই রক্ষাকবচ স্বরূপ তাহাদের সমক্ষে সতত বিরাজ করিত। বালক-সুলভ চপলতার জন্য শাস্তি প্রাপ্তি হইতে তাহাদের রক্ষা, নিজ নিজ সাধ ইচ্ছার কথা পিতার নিকট খুলিয়া বলিবার দায় হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি-দান প্রভৃতি নানাবিষয়ে সে কবচ তো কার্য্যকরী হয়ই অন্যান্য গুরুতর বিষয়েও তাহার শক্তির পরিচয় প্রত্যক্ষীভূত হয়।

First aid ও *nursing*এর চর্চা বা আলোচনা করিবার অল্প-বিস্তর সুযোগ অধুনা সাধারণ বিদ্যালয়ে বালিকারা প্রাপ্ত হয়। বিজলীর ভাগ্যে তাহা কখনো ঘটে নাই ; কিন্তু তাহার জননী ও মাতামহীর কঠিন পীড়ার সময়ে সুশিক্ষিতা সেবিকার মত সে তাঁহাদের শুশ্রূষা করিয়াছে। মধ্যমাগ্রজের পীড়ার সময়ে বিজলীর সেবাপদ্ধতি দেখিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও চমৎকৃত হ'ন। অভিজ্ঞাদিগের (*nurse*) কার্য্যাবলী, নিত্য তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু সেই অনভিজ্ঞা সেবারতা বালিকার কার্য্য-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অসাধারণ বলিয়াই মনে হয়। এ বিদ্যা এ শক্তি বালিকা কেমন করিয়া লাভ করিল ? কর্ম্মে স্পৃহা, প্রকৃতির স্থৈর্য্য, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও ধর্ম্মে-আস্থা যাহার থাকে সেবাকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ তাহার পক্ষে কঠিন কি ?

বিজলীর যত্নে পীড়িত ভ্রাতার কক্ষটী সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত। শয্যা ও পরিচ্ছদ মলাহীন ; শুদ্ধবেশে শুদ্ধচিত্তে নির্দ্দিষ্ট আহার ঔষধ প্রদান— কোনো কার্য্যে শৈথিল্য তাহার নাই।

জনতা ও কোলাহল কক্ষে ত দূরের কথা তাহার সন্নিকটেও যাহাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা, সূর্য্যালোক বা তড়িতালোক পীড়িতের চক্ষু-পীড়াদায়ক না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি, রোগীর ক্ষীণ ইঙ্গিতটীও শুশ্রূষাকারিনীর শ্রুতি বা দৃষ্টি অতিক্রম না করে, যথাসাধ্য তাহার উপায় অবলম্বন—কোনো বিষয়ে বালিকার এতটুকুও অমনোযোগিতা নাই। রোগীর প্রফুল্লতা রক্ষণে তাহার অভিনব উৎসাহ। প্রাণমন দিয়া অহঃরহঃ পীড়িতের মনোভাব নিরাকরণে ঐকান্তিক যত্ন !

ঘোর সঙ্কটকালেও বিজলী স্থির ধীর—সেবা-নিপুণতা শতগুণ বর্দ্ধিত! স্নেহময়ী ব্যাকুলা ভগ্নী বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া তখন সঙ্কটনাশিনী মহাশক্তির বলে যেন শক্তিমতী!

সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর গৃহস্থের 'ধড়ে' যখন প্রাণ আসে তখনও সেবিকার বিশ্রামের অবকাশ নাই। অধিকতর সতর্কতার সহিত সেবা কার্য্যে তখনও সে নিযুক্তা। আততায়ী বিফল মনোরথ হইয়া সুযোগ প্রাপ্তিমাত্র দ্বিগুণবলে যদি পুনরাক্রমণ করে তাহাও নিস্ফল করিয়া দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রোগীর শিয়র দেশে সেবিকা তখনও সমাসীন!

চিকিৎসকের নির্দ্দেশানুসারে দুর্ব্বল পুত্রের কল্যাণার্থে গৃহস্বামী অচিরে সাঁওতাল-পরগণাস্থিত জামতাড়ায় সপরিবারে গমন করেন। সেই কারণে একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ মাস সকলকে সেস্থানে বসবাস করিতে হয়। যে সেবানিপুণতায় বিজলীর মরণোন্মুখ ভ্রাতার জীবন রক্ষা হয় তাহাতে তিলমাত্র শিথিলতা এই চতুর্দ্দশ মাসের মধ্যে একদিনের জন্যও দৃষ্ট হয় নাই। জামতাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এই পরম স্নেহশীলা ভগ্নির সেবা শুশ্রূষার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিত।

নিত্য ভ্রমণে বহির্গত দুর্ব্বল ভ্রাতার পার্শ্বচারিণী—স্নেহময়ী ভগ্নী! বহির্গমনকালে ভ্রাতার সঙ্গীর অভাব হইত না, কিন্তু বিজলী তাহার সঙ্গ তথাপি ছাড়িত না। সতত তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নানা উপায়ে তাহার চিত্তের প্রফুল্লতা বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াস পাইত। যে ভার সে সেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিধি পালন করা অনভিজ্ঞ ত দূরের কথা নব-নিযুক্ত অভিজ্ঞের পক্ষেও সুকঠিন, ইহা মনে রাখিয়াই দুর্ব্বল সহোদরের

শয়নে, জাগরণে, আহারে ভ্রমণে—প্রতিকার্য্যে সতত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে রাখিত।

সুযোগ পাইলেই আত্ম-পর নির্ব্বিশেষে বিজলী সকলেরই সেবা করিত। জামতাড়ার বংশীমালীর বালক-পুত্র "হরিয়া" অস্পৃশ্য-জাতির হইলেও কঠিন পীড়াকালে বিজলীর ঐকান্তিক সেবা শুশ্রূষা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। জামতাড়ায় অবস্থানকালে জননীর সহিত তত্রত্য তদানীন্তন সব্‌ডিভিসনাল্‌ অফিসারের পত্নীর বিশেষ হৃদ্যতা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ শ্রীযুক্ত অমুল্যধন বন্দোপাধ্যায় একবার প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হ'ন। একে বিদেশ তাহার উপর স্বামীর পীড়া! পত্নী নীরা দেবী বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়েন, কারণ দাসদাসী ভিন্ন সেখানে তাঁহার আর অন্য সহায় ছিলনা। পীড়ার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বিজলী ম্যাজিষ্ট্রেটের 'বাংলায়' উপস্থিত হয় এবং পীড়িতের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে।

দাসদাসীরা অসুস্থ হইলে 'দিদিমণির' নিকট ঔষধাদির জন্য ছুটিয়া আসিত। চিকিৎসকের দ্বারা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইলেও বিজলী পরিত্রাণ পাইত না! দিদিমণির উপরই তাহাদের অগাধ বিশ্বাস! ঔষধ-পত্র সুতরাং বিজলীকে দিতে হইত। সেই জন্য ঔষধ-পত্রের নাম ও সে সকলের ব্যবহার সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর তথ্য তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। রোগীর অবস্থা বিশেষে ঔষধাবলীর ব্যবহার শিক্ষা করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করে দীন ও আর্ত্তের সেবায় পরে তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয়। দরিদ্রকে ঔষধ ও পথ্য দানে বিজলী মুক্ত হস্ত হইত।

মাতামহের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত কার্‌মাইকেল্‌ মেডিকেল্‌ কলেজ-হাঁসপাতালে যাইবার সুযোগ একাধিকবার সে প্রাপ্ত হয়। রোগীদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে পারিয়া এবং তাহাদের মধ্যে ফল ও মিষ্টান্নাদি

বিতরণ করিয়া বালিকার আনন্দের সীমা থাকে নাই। জামতাড়ার জেল্ দেখিয়া আসিয়া কারারুদ্ধদিগের অনেক অভাব অভিযোগের কথা সে জানিতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে তাহা জানাইয়া এবং তাহার উপায় করিয়া লইয়া তবে বিজলী তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেয়।

জামতাড়ায় জলকষ্ট বিজলী দেখিতে পায়। বর্ত্তমান কূপের জলও যে অনেক স্থলে পান-যোগ্য নহে—এই অভিযোগ যথাস্থানে করিতে বালিকা কালক্ষেপ করে নাই। ফলে কূপ-সংস্কার ও শোধন কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হয়।

জামতাড়া জংবাহাদুর স্কুলের গৃহ-সংস্কার কার্য্যও সেই সময়ে আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য ক্রীড়ার স্থান প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থাও হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুরোধে বিজলীর পিতা তাহা প্রস্তুত প্রভৃতির পরিদর্শন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সেই কার্য্যে বিজলী নানাপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করে। জামতাড়া বিবেকানন্দ আশ্রমের আংশিক গৃহ-সংস্কার কার্য্যও তাহারই চেষ্টায় হয় এবং "মাতৃ-আশ্রমের" উন্নতিকল্পে পরিচিতবর্গকে তাহার জন্য সাহায্য দানে বিশেষভাবে অনুরোধ সে করে।

সখী সঙ্গে

বিজলীকে যে, যে মূর্ত্তিতে দেখিবার বাসনা করিয়াছে—সে সেই মূর্ত্তিতেই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে। প্রাতঃকালে তাহার এক মূর্ত্তি, মধ্যাহ্নে অন্য মূর্ত্তি, অপরাহ্নে সন্ধ্যায় ও সায়ংকালে আবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি! শুভ্রবেশা, হসিত-নয়না, প্রসন্ন-বদনা বিজলী, প্রাতে সাংসারিক কার্য্যে নিমগ্না। কার্য্যশেষে মধ্যাহ্নে—মাতৃপার্শ্ব-সংলগ্না সারল্যের সে প্রতিচ্ছবি। অপরাহ্নে—কলাকার্য্য-কৌশলা ব্রহ্মার মানস-পুত্রী। সন্ধ্যায়—ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং রাত্রিকালে—নিদ্রাতুরা স্বর্গের পারিজাত।

গুণমুগ্ধ কত শত ভক্ত বালিকার নানা দিব্যরূপ দর্শনে নয়ন মন চরিতার্থ করিয়া উছলিত প্রশংসায় স্নেহ, প্রীতি, ভক্তির অঞ্জলিদানে সচঞ্চল! সখীরূপেও বিজলীর অগণ্য ভক্ত। মুরলীর রবে ব্রজভূমে একদিন যেমন আকুল সাড়া পড়িয়া যাইত, মধুর সখ্যের আকর্ষণে বিজলীর সঙ্গিনীরাও তেমনি অন্য শত আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া তাহার কাছে দলে দলে ছুটিয়া আসিত। নয়নের মণি করিয়া বিজলীকে লইয়া সকলে উন্মত্ত! গৃহ-সংসারের কথা কাহারও কিছু মনে থাকিত না। কলহাস্যে, আনন্দে, গানে, গল্পে একটা অপার্থিব ভাবের সৃষ্টি করিয়া তাহারই প্রবাহে দূরে অতিদূরে নিজেদের ভাসাইয়া দিয়া উন্মুক্ত প্রাণে উৎফুল্ল হৃদয়ে বাধ-মুক্ত পল্লবিনীর মত সকলে আনন্দ-বিভোরা!

অভিনব এক সম্প্রীতি-রাজ্য স্থাপন এমনি করিয়া তাহারা করে। বিজলীকে রাণী করিয়া তাহারই হাতে সেই রাজ্য-পাট তাহারা তুলিয়া দেয়। দিনে দিনে রাজ্যের সুখ শান্তির সীমা থাকে না। প্রজা-পুঞ্জ রাণীর প্রাণ—সে কায়া তাহারা ছায়া।

কচিৎ কোন প্রজা বিদ্রোহভাবাপন্না হইলে অমোঘ শস্ত্র নিক্ষেপে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতে রাণী কাল বিলম্ব করিত না। যাহার গভীর তুণ, বিমল হাস্য, স্বর্গীয় প্রীতি ও অকৃত্রিম স্নেহে পরিপূর্ণ, বিদ্রোহ দমন তাহার একটা সামান্য ফুৎকার সাপেক্ষ মাত্র। সত্য যাহার ধর্ম্ম সরলতা যাহার বর্ম্ম কুটিলতার ভ্রূভঙ্গি বা মিথ্যার অভিযান কি সে স্থানে কার্য্যকরী হয়? চক্ষের নিমেষে সে সকলের ধ্বংশ যে অনিবার্য্য। কোনো দ্বন্দ্বকলহপ্রিয়া বালিকা তাহাকে উত্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বিজলী এমন একটা কৌতুককর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে নিজ অশিষ্টতার জন্য অপরাধিনী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তৎক্ষণাৎ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। বিজলীর মধুর হাসি যে স্থানে কার্য্যকরী হয় নাই সে বালিকার আশা সে ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে রাগদ্বেষভাব কখনো পোষণ করে নাই।

দিবসের সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সুবেশা বিজলী প্রফুল্ল হৃদয়ে সখী সম্মিলনের জন্য প্রতি অপরাহ্নে প্রস্তুত হইয়া থাকিত। এক এক করিয়া সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে অপ্রয়োজনীয় শত কথায়, অসংখ্য উদ্ভট গল্পের অবতারণায়, অর্থহীন হাস্য পরিহাসের লহরে—মিলন সকলে মধুময় করিয়া দিত। মিলনের পর অনিচ্ছায় পরস্পরে পরস্পরের নিকটে বিদায় গ্রহণ। পরদিন দ্বিগুণ উৎসাহে আবার নব রঙ্গ, নব ক্রীড়া, নব ভাবে নব উন্মাদনা।

নিতান্ত অপরিচিত স্থানেও সঙ্গিনীর অভাব বিজলীর কখনো হয় নাই। নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া প্রতিবেশিনী বালিকারা বিজলীর নিকট উপস্থিত হইয়াছে। অল্পক্ষণের আলাপে মোহিতা হইয়া আবার তাহাদের আসিতে হইয়াছে। দুই দিনেই চিরপরিচিতার আসনে

—মারলোর সে প্রতিচ্ছবি— (পৃঃ ৭১)

তাহাকে বসাইয়া হৃদয়ের দ্বার তাহাদের, তাহার নিকটে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত! জামতাড়া বাসকালে, স্থানীয় এবং কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত বহু বালিকা অচিরে বিজলীর সখী শ্রেণীভুক্ত হয়। স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে "ডলিরাণীর" বক্ষ-সংলগ্ন হইয়া তাহারাও যত কাঁদিয়াছে, তাহাকেও তত কাঁদাইয়াছে।

প্রবীণা রমণীগণও তাহার কাছে একবার বসিলে সহজে উঠিতে পারিতেন না। বিজলীর হাসি, গল্প, গানে প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। নিজ নিজ সংসারের করণীয় কার্য্য অবহেলা করিয়া স্বচ্ছন্দে তখন তাঁহারা বালিকার সহিত কৌতুক-রঙ্গে নিমগ্না থাকিতেন। কেহবা শিক্ষার্থিনী হইয়া তাহার নিকট শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা করিতে একাগ্রচিত্ত—মাতা কন্যা তখন একাসনে বিরাজমানা!

ব্রাহ্মণ পত্নী নীরাদেবী বিজলীকে পাইয়া তাঁহার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইতে বোধ হয় উদ্যত হ'ন। প্রথম দর্শনেই বালিকাকে তিনি পরম স্নেহের চক্ষে দেখেন। অচিরে তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহাধিক্য সকলেই দেখিতে পায়! বিজলীকে সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে পাইলে তিনি আর কিছু চাহিতেন না। প্রত্যহ বিজলীর সঙ্গ তাঁহার চাই-ই। কোনো কারণে তাহা না ঘটিলে অস্বচ্ছন্দতার তাঁহার সীমা থাকিত না। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সহিত বিজলীকে পরিচিতা করিয়া দিবার সময়ে তাঁহার গর্ব্বোৎফুল্ল মুখভাব, দশের মাঝে অবস্থিতা সরল হাস্যময়ী সেই বালিকার প্রতি তাঁহার পলকহীন স্নেহার্দ্র-দৃষ্টি, সর্ব্ব সমক্ষে উচ্চ-কণ্ঠে তাহার অশেষ প্রশংসাবাদ—এত করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। বিজলীর কথা মনে পড়িলেই তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন—তাহা কে জানে সন্ধ্যা কে জানে রাত্রি দ্বিপ্রহর। বিজলীর জননী রঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বলিতেন, "মেয়ের মন্তরের জোর আছে।" সহোদরা-তুল্যা নীরা দেবী

তাহাতে বলিতেন, "দিদি জোর কি অম্‌নি হয় সাধনা চাই।" দূর হইতে এই প্রবীণা ও নবীনাকে দেখিয়া তৃতীয় ব্যক্তি দুই জনের মধ্যে সখী ভাবের সুদৃঢ় বন্ধনই দেখিতে পায়। বিজলীর কলিকাতা প্রত্যাগমনের দিনে উভয়ের মধ্যে বিদায় দান ও গ্রহণের দৃশ্যে দর্শক-দিগের চক্ষুও আর্দ্র হয়।

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া বিজলী এক নূতন সখী লাভ করে। আগরানিবাসী খাণ্ডেল্‌ওয়াল্‌ বংশজ মাতৃহারা চারি বৎসরের মালতী যেন 'ওৎ' পাতিয়া বসিয়াছিল। বিজলীকে দেখিয়াই নির্ভয়ে তাহার বক্ষের উপর সে ঝাঁপাইয়া পড়ে। উভয়ের মধ্যে কোনো পরিচয়ই পূর্ব্বে ছিল না। উভয়ে উভয়কে দেখিবামাত্রই কিন্তু চিরপরিচিতার ন্যায় ব্যবহার করে। জননীর সোহাগে, ভগ্নীর স্নেহে বিজলী মালতীকে বক্ষে তুলিয়া লয়। দিবাসময় অধিকাংশ সময়েই "বিজলী দিদি" যেখানে মালতীও সেই খানে থাকিত। ক্রমে, রাত্রি দুই তিন প্রহর অতীত হইয়া যাইলেও মালতী বাড়ী ফিরিবার নাম করিত না। বিজলী একবার মালতীকে বলে, "বাবুজী এতো ডাকাডাকি করেন—তুমি যাও না—বাবুজীর মন কেমন করে তো?" আর মালতী বলে "আমি চ'লে গেলে তোমার মন কেমন ক'রবে যে।" বিজলীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বাংলা কথা বাঙ্গালীর মেয়ের মত অবাধে বলিতে মালতী শিখিয়াছিল। ক্রমে বাংলাই তাহার 'মাতৃভাষা' হয়। বিজলীদিদিকে গল্প শুনাইতে সে বড় ভালবাসিত। হিন্দী গান অপেক্ষা বাংলা গান শিখিতে সে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করে। 'রোটী', 'পুরী' ছাড়িয়া লুচিরই সে পক্ষপাতিনী হয়। বেশভূষায় বিজলী দিদির ধরণধারণই শ্রেয়ঃ বলিয়া সে গ্রহণ করে। আগরার মেয়ে বিজলীর হাতে পড়িয়া ষোল আনার উপর আঠার

আনা বাংলার মেয়ে হইয়া যায়। সখী-পরিবেষ্টিতা বিজলীর পার্শ্বদেশে এই শিশু-সখীটীর অবস্থানে সম্মিলনের শোভা বর্দ্ধিতই হইত।

বিজলীর রঙ্গপ্রিয়তায় ও সদানন্দ ভাবে জননীর খুল্লতাত ভগ্নিরা ও তাহার মাতুলানী এবং জ্যেষ্ঠতাত ভগ্নী ও পুত্রবধূরা বয়সের পার্থক্য ও সম্পর্কজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া স্বচ্ছন্দে তাহার আনন্দ-কোলাহলে যোগদান করিত।

বিদ্যানুশীলনে

রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠে বিজলী যে জ্ঞান অর্জ্জন করে তাহার পরে পাঠাদি আর না করিলেও তাহার চলিত। কাষ্ঠ-তরী স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে যে দেখিয়াছে, যাহার সম্মুখে পাষাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সাগর বন্ধন হইয়াছে—উদ্ভিদের যে জীবন আছে নূতন করিয়া তাহা সে কি দেখিবে? তাহাতে তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাইবেই বা কি করিয়া?

রাক্ষসের রাক্ষসী দৃষ্টি দিগন্ত প্রসারিত। ন্যায় ও অন্যায়ের সংঘর্ষ অহঃরহঃ বিদ্যমান। ভয় কি তাহাতে? ধর্ম্ম ও সত্যের জয় এবং অধর্ম্ম ও অসত্যের পরাজয় যে অনিবার্য্য। রামায়ণ মহাভারত এই মহান শিক্ষাই বিজলীকে প্রদান করে। সংসারে তাহাই পাথেয় করিয়া অবিচলিত পদে গন্তব্য পথে সে অগ্রসর হয়।

ইংরাজী সাহিত্যে বিজলী বিশেষ অমনোযোগী দেখিয়া পিতা অনুযোগ করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থাদি দেখাইয়া কন্যা পিতাকে বলে, "এ সব

তাহ'লে থাক্।" পিতা হাসিয়া বলেন, "অর্থাৎ ইংরিজি পড়বো না, এই তো—কর তোমার যা ইচ্ছা কিন্তু ব'লে রা'খছি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।" পিতার কথা শুনিয়া কন্যা হাসিয়া আকুল হয়। ইহার পরে ইংরাজী পুস্তকাদি লইয়া কয়েকদিন নাড়াচাড়া বিজলী করে। পিতৃবন্ধু ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন সে কথা শুনিয়া বিজলীকে বলেন "মাও তাহ'লে বিমাতা হয়। পরগাছার জঙ্গল হ'য়ে গেছে যে! সন্তানদের বাঁচাবার উপায় মা না ক'রলে কে ক'রবে রে বেটি?" কোনো কথা না কহিয়া সহাস্য-নয়নে বিজলী প্রশ্নকারীর দিকে চাহিয়া থাকে।

সকল যুগের বাংলাসাহিত্য অনুশীলনে বিজলীর বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় কোথায় যেন কি হারাইয়া গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার বিশেষ চেষ্টা! কোনো খ্যাতনামা লেখকের "বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস" বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করে তাহাতে একমত হইতে না পারিয়া সেই তথ্য অনুসন্ধানে সে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু বাংলা সাহিত্য বা ইতিহাসের ধারাবাহিক একটা অক্ষুণ্ণ গতি খুঁজিয়া না পাওয়ায় হতাশ হইয়া পড়ে।

পুরাতন বঙ্গসাহিত্যিকগণের গ্রন্থাদি পাঠে বিজলী প্রথমে সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গসাহিত্যকে যাঁহারা শ্রীশালিনী করিয়াছেন, পুরাতনেরা তাঁহাদিগেরই যে আদি একথা বালিকার যখন মনে পড়ে সেই মহাপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানে বালিকা তখন তাহার অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। স্বদেশীয় সাহিত্যে কিন্তু পাশ্চাত্য-ভাবের আধিক্য যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালেও তাহার মোহ হইতে মুক্তি পাইবার কোন চেষ্টা না করিয়া অনেক শক্তিশালী লেখকও যে তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন তাহা এই নবীনা পাঠিকার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

বিজলী যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিত, অনেকস্থলে সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই সে করিত না। কোনো কোনো গ্রন্থের কিন্তু চুল চিরিয়া সমালোচনা করিতে সে বসিয়া যাইত। উদাহরণ স্বরূপ তাহার সমালোচনার কিয়দংশ প্রদত্ত হইল।

"কৃষ্ণচরিত্র"—শক্তিশালী সম্রাট জানিয়া শুনিয়া উদ্ভট্ ভাবের ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

"মেঘনাদ বধ"– মধুসূদন যাহার স্রষ্টা তাহার জয় অনিবার্য্য।

"রৈবতক"—আঁই, আঁই, আঁই মানুষের গন্ধ পাই—আমাদের হাতে পড়ে এ কেষ্টোর বাঁচা দায় হবে।

(বালিকা তাহার "নবঘনশ্যাম মুরতি মনোহরের" তিলমাত্র রূপ কেহ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে ব্যথা পাইত।)

"কৃষ্ণকান্তের উইল"—বঙ্কিম বাবু মেয়েটাকে (ভ্রমর) বেজায় নভেলী করে দিয়েছেন।

(সীতারামের 'শ্রী' দেখিয়া কিন্তু বালিকা আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে)

ইংরাজী সাহিত্যে আসক্তি না থাকিলেও সেই মহাসমুদ্রের অমূল্য রত্নরাশি বিশেষের সন্ধান পিতৃসাহায্যে সে প্রাপ্ত হয়। প্রথিতযশা আধুনিক কোন সাহিত্যিকের পুস্তকের পর পুস্তক পাঠে তাহার মনে হয় যে সেই অপূর্ব্ব গবেষণার আভাষ অন্যত্র কোথাও সে পাইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া সে দেখিতে পায় যে আলোচ্য পুস্তকাবলী তদবধি অপ্রাপ্তযশ মার্কিণ পুস্তক সকলের চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। তথাপি সে স্বীকার করে যে তাহার ন্যায় পাঠক পাঠিকার জন্য এরূপ গ্রন্থকারের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থরাজিই সম্পূর্ণ জাতীয়ভাবে প্রভাবান্বিত বিজলী দেখিতে পায়। যুগ যুগান্তরের পরিচিতের সাক্ষাৎ পাইলে

তাহাকে বিদায় দিতে যেমন প্রাণ চাহে না এবং তাহার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পরিস্ফুট করিয়া কথায় বুঝাইয়া দিবার শক্তিতে কুলায় না, মহাকবির গ্রন্থরাজি হাতে করিয়া বালিকার সেই অবস্থাই হয়। সে দেখিতে পায় রামায়ণ মহাভারত মূর্ত্ত হইয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সামাজিক, ঐতিহাসিক কবিবরের সকল গ্রন্থই সেই মহাগ্রন্থদ্বয়ের মহাদ্যুতিতে আলোকিত! এক এক করিয়া সমগ্র গিরিশ-গ্রন্থাবলী এক বার দুই বার বহুবার পাঠ শেষ করিয়াও তাই বিজলী সে সকল পরিত্যাগ করিতে পারিত না। তাহা লইয়া আবার বসিত। গিরিশ বাবুর শকুনি দেখিয়া সে কিন্তু তুষ্ট হইতে পারে নাই বিস্‌মার্কের বিপক্ষে ফল্‌ষ্টাফ্‌কে দাঁড় করাইলে যেমন দেখায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষে ভাঁড় শকুনিকে দাঁড় করাইয়া তাহাই করা হইয়াছে বলিয়া পাঠিকার মনে হয়। পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে কুরুকুলে বন্ধুরূপে শকুনির আবির্ভাব এবং কুরুবংশ ধ্বংশ করিতে প্রতিপদে বীভৎস প্রতিহিংসা ভাব-সম্পন্ন চরিত্র তাহার চিত্রিত না করিয়া মহাকবি কি কারণে পেশাদারী যাত্রার 'হাড়-গোড় ভাঙ্গা' নিকৃষ্ট রঙ্গাবতারের অবতারণা করেন তাহা ভাবিয়া বিজলী কূল পায় নাই।

অন্যান্য বিষয়ের অপেক্ষা দেশীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতিই বিজলীর সমধিক মনোযোগ প্রদত্ত হয়। ইহা ভিন্ন গ্রাম্য ভাষার চর্চ্চায় সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা কহিবার শক্তি বিজলী অর্জ্জন করে। পঞ্চম জ্যেষ্ঠতাত প্রণীত "ঝঞ্ঝা" পাঠ করিয়া চট্টগ্রামের মাঝি-মাল্লার কথা সে এমন নিখুত করিয়া বলিতে আরম্ভ করে যে নাট্যামোদী নাট্যালয়ের অভিজ্ঞ শিল্পীর নিকটেও কচিৎ তাহা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার ভাষা বালিকা অবাধে

কহিয়া যাইত। জামতাড়ার, (মানভূম, বাংলা ও সাঁওতালী মিশ্রিত) ভাষা দুইদিনে সে আয়ত্ত করিয়া লয়। নানাস্থানের ভাষায় কথা কহিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া সেই সকল ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সে বিশেষ যত্নবতী হয় এবং তাহা করিতে অসংখ্য ছড়া ও গল্প সংগ্রহ করিয়া ফে'লে। সেই সকল দেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতির অনেক তথ্যও সেই সূত্রে বিজলী জ্ঞাত হয়।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহার্থ খ্যাতনামা লেখকদিগের ভ্রমণকাহিনী পাঠেও বিজলীর অনুরক্তি বড় অল্প ছিল না। মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত স্যার্ দেবপ্রসাদের "ইয়োরোপে তিনমাস" ও পিতার অপ্র-কাশিত পত্রাবলী ইয়োরোপের সাধারণ চিত্র ও জ্যেষ্ঠতাত ডাঃ সত্যপ্রসাদের "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা" বিশেষভাবে ইংলণ্ডের চিত্র তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেয়। আমেরিকা হইতে মাতামহের পত্রাবলী সেই যক্ষের দেশের কাহিনী সরলভাবে তাহার নিকট বিবৃত করে। এই সকল পাঠে তাহার মনে হয় যে স্থান কাল ও পাত্রভেদে আচার, ব্যবহার, বসন, ভূষণ, ক্রীড়া, কৌতুক, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম অনুসরণই শ্রেয়ঃ। একজনের পক্ষে যাহা সুধা অন্যের পক্ষে তাহা হয়তো গরল!

সভ্যদেশের সভ্য-কাহিনী পাঠ করিয়াও স্বদেশের আচার ব্যবহারা-দিরই সমাদর বালিকা করিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্নমুখী শিক্ষায় শিক্ষিতা হিন্দু-কন্যার ঋষি প্রণোদিত পথানুসরণই যে সার কর্ত্তব্য—বয়সে বালিকা হইলেও, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিজলীর কাল বিলম্ব হয় নাই।

সঙ্গীত ও শিল্প-বিদ্যায়

বিজলীর গান শুনিয়া ভারতের একছত্র স্বরদী প্রফেসর্ কেরামৎউল্লা খাঁসাহেব একদিন আদর করিয়া তাহাকে বলেন "বেহেস্তের সুর কোথা থেকে পেলি মা।" ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই বালিকার মুখে গানের একটা কলিও কেহ শুনে নাই। শৈশবে তাহার মাতুলালয়ে, বালক বালিকারা যখন "সঙ্গীত চর্চ্চা" করিত বিজলী তাহার ধার দিয়াও তখন যাইত না। বৈষ্ণব ভিক্ষুকের গান সে কিন্তু একমনে শুনিত এবং আসরে রামায়ণ-গান শুনিতে বসিয়া তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইত না। রামায়ণ-গান শুনিয়াই বালিকা আপন মনে গান গাহিতে আরম্ভ করে; সঙ্গীত শিক্ষাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। এই সময়ে বহু যাত্রাগান শুনিবার সুযোগও তাহার ঘটে সে সকল গান যেন সে 'গিলিয়া খাইত।' গান শুনিবার পরদিন যাত্রার ছেলেদের গানের সুর হুবহু অনুকরণ করিয়া সকলকে শুনাইতে বিজলী বসিত। কন্যার 'কৃতিত্বে' জননী অধিকতর উৎসাহে তাহাকে শিক্ষা দান করিতে থাকেন। অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষয়িত্রী শিষ্যার মধুরকণ্ঠে তাল-লয়-সমন্বিত রাগিণীর অবিকৃত-রূপ-সৌন্দর্য্য দেখিতে পা'ন এবং কোনো অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের হস্তে তাহার শিক্ষার ভার প্রদান করিবেন মনে করেন কিন্তু তাহা করা হয় নাই। জননীর নিকটই কন্যার শিক্ষাগ্রহণ চলিতে থাকে।

শিক্ষা দানকালে রাগ রাগিণীর আট ঘাট সব বুঝিয়া লইয়া যন্ত্র-সুরের সাহায্যে বিজলী সে সকলের যথাযথ রূপদানে সক্ষম হইলেই সেই রাগ বা রাগিণী যেন ইঙ্গিতে, তাহার অনুজ্ঞামত চালিত হইয়াছে। নূতন পাঠ

লইয়া অল্পক্ষণের অভ্যাসেই বালিকা পাঠ আয়ত্ত করিয়া ফেলিত। ইহা জ্ঞাত হইয়া তাহার পিতৃবন্ধু কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্বরদ ও বেহালাবাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ তাহাকে যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করেন। বিজলী তখন দশম বৎসর অতিক্রম করিয়া একাদশে পদার্পণ করিয়াছে। সম্ভ্রম সহকারে সে শরৎ বাবুকে বলে, "আগে গানই হোক!" বালিকার কথায় তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তাহার কণ্ঠ-সঙ্গীত সাধনায় সাহায্য করিতে অগ্রণী হ'ন। বিশ্ববিশ্রুত কৌকভখাঁর পদপ্রান্তে বসিয়া শরৎ বাবু যন্ত্র-সঙ্গীতের আরাধনা করায় বিজলী তাঁহার শিক্ষায় খাঁটি তান্‌সেনী-ঢং শিক্ষা করিবার সৌভাগ্য লাভ করে এবং গ্রামোফোন্ রেকর্ড্ বা রেডিওয়ে গীত অসংখ্য সঙ্গীত সেই ছাঁচে ঢালিয়া গাহিতে আরম্ভ করে। তাহার সেই সকল গান শুনিয়া সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কেরামৎউল্লাখাঁ সাহেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

জামতাড়া মাতৃআশ্রমের সুধাকণ্ঠী অধিনেত্রী বিজলীর গান শুনিয়া মোহিতা হ'ন। তাঁহার আশ্রমদেবতার সম্মুখে গান গাওয়াইতে তাহাকে বহুবার তিনি লইয়া যান। তিনি বলিতেন, "বিজলীর কণ্ঠে এমন একটা স্বর-সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান যাহা দেবতারও উপভোগ্য।" কমনীয়া এই বালিকার সঙ্গীত মাধুর্য্যে আবিষ্টা হইয়া তাঁহার অর্জ্জিত সমগ্র সঙ্গীত-বিদ্যা অকাতরে তাহাকে দান করিতে তিনি অগ্রসর হ'ন।

গীতবাদ্যে বাংলার উজ্জ্বলরত্ন শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ শীল, সুপ্রসিদ্ধ হার্‌মণিয়ম্-বাদক রফিকখাঁ, গায়ক-শ্রেষ্ঠ পিয়ারাখাঁ সাহেব প্রভৃতির অপূর্ব্ব কলা-কুশলতা প্রত্যক্ষ করিবার যথেষ্ট সুযোগ বালিকা প্রাপ্ত হয়। একলব্যের মতই অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে

তাহার সঙ্গীত-বিদ্যার পথ সে প্রসারিত করিয়া লয়। আর বঙ্গদেশের কীর্ত্তনীয়াদের দেবদুর্ল্লভকণ্ঠে সুমধুর পদাবলী শ্রবণে বাংলার নিজস্ব কীর্ত্তনে প্রাণ মন ঢালিয়া শ্রোতৃবর্গকে পুলকরোমাঞ্চিত করিয়া দিবার ক্ষমতা বালিকা অর্জ্জন করে।

ন্যূনাধিক চারিশত বাংলা ও হিন্দি গান বালিকার আয়ত্তাধীন হয়। ইহা করিতে ছয় বৎসরের অধিক সময়ের প্রয়োজন তাহার হয় নাই। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি বাংলায় যত গান রচিত হইয়াছে চুনিয়া চুনিয়া তাহার সার সংগ্রহ করতঃ সে তাহার গানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে এবং পাত্রপাত্রীর যোগ্যতা বিচার করিয়া সেই ভাণ্ডারের স্থান বিশেষ তাহাদিগকে পরিদর্শন করিতে দিতে সে সদাই প্রস্তুত থাকে। স্থান ও পাত্র হিসাবে একই গান তাহার কাছে বিভিন্ন ভাব-সংযুক্ত। শিশুর দল বিজলীদিদির নিকটে 'রাধানামে সাধা বাঁশী'—শিখিয়া নূতন খেলায় উন্মত্ত। সুর-ভঙ্গিমায় আবার এই গানের মধ্যেই শ্যামরায়ের মধুর মুরলীধ্বনির ইঙ্গিতে শ্রোতা পুলকিত। তাহার কণ্ঠে "রাম রহিম্ না জুদা করো" অতি পুরাতন গানটি চিরসৌন্দর্য্যের বিমল আভায় সকলের মন প্রাণ যেমন তৃপ্ত করিয়াছে, তেমনি যখন সে গাহিয়াছে "মম যৌবন নিকুঞ্জে সখি জাগো" তখনও তাহাই ঘটিয়াছে।

"যার চেয়ে আর সুন্দর নাই" সেই পরম সুন্দরের আরাধনায় শুদ্ধা ভক্তি প্রীতির অঞ্জলি প্রদানের জন্যই বালিকা গীত-মুখরা। তাই তাহার সঙ্গীতালাপে ভক্তি ও ভাবের একটা পূর্ণতা ও সজীবতায় শিশু হইতে প্রবীণ পর্য্যন্ত সকলেই আনন্দে অধীর হইত। বালিকাদিগের সঙ্গীত-শিক্ষার আজীবন-বিরুদ্ধবাদীও বালিকার গীত-সুধা পানে তাঁহার মত আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, আর সঙ্গীতে নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গ স্থির উৎকর্ণ ভাবে সেই কণ্ঠনিঃসৃত অমিয়ধারায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ আচরণ করিয়াছে।

হরি, হর, কালী, কালা—ভক্তিমতী বালিকা যখন যাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছে—তাহার সুরের ঝঙ্কারে, তানের লহরীতে, ভাবের মুর্চ্ছনায় মনে হইয়াছে যে সে তাঁহারই উপাসিকা আর কাহারও নহে। আবার যখন সে কালীকে বাঁশী ধরাইয়াছে, হরি-হর মিলাইয়া দিয়া তাঁহাদের চরণ-পূজা করিয়াছে তাহার নয়নে বদনে একটা প্রীতির তরঙ্গ তুলিয়া শ্রোতৃবর্গকে তাহাতে নিমজ্জিত সে অনায়াসেই করিয়া দিয়াছে।

"নবঘন শ্যাম মূরতি মনোহর হামারই হিয়াপর আওয়ে"—গানটী বিজলীর জননীর বড় প্রিয়। কন্যার নিকট বার বার তাহা শুনিয়াও আবার শুনিবার তাঁহার সাধ হইয়াছে। গৃহাধিষ্ঠিত যুগলমূর্ত্তির সম্মুখে কতবার যে তিনি সেই গান গাওয়াইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। গায়িকার কণ্ঠে তখন কি আকুলতা, চক্ষে কি তন্ময়তা! ভক্ত যেন তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না; আরো দিবার শক্তি যাচ্ঞা করিতেছে আর মুর্ত্তিমতী রাগিনী কণ্ঠে বসিয়া তাহার সেই বাসনা পরিস্ফুট করিতেছে। ভক্তির উচ্ছ্বাসে মুরলীধর বুঝি ভক্তের মুখদিয়া তখনি বলাইয়াছেন "রাধানামে অভিলাষী রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।" ভক্ত যে তাঁহার প্রাণ! তাহারই জন্য না দ্বারে দ্বারে তিনি বংশী-নিনাদ করিয়া ফিরিতেছেন! সেই মধুর বৃন্দাবন, সেই বংশীবট, সেই বাঁশরী-লীলা কাহার জন্য? সেই গান শেষ করিয়া আকাশ বাতাস মধুময় করিয়া দিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বালিকা তখন গাহিত, "তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু!"

প্রেম-সঙ্গীত বলিয়া খ্যাত অনেক গান বিজলী গুরুজনবর্গের সমক্ষেও স্বচ্ছন্দে গাহিত। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তানের পর তান তুলিয়া কী প্রেম নিবেদনের ঘটা—সে প্রেমে কলুষের ছায়া নাই—গাহিবার ভঙ্গিমায় তাহা স্বর্গীয় প্রেমে উদ্ভাসিত। গানের সুরে প্রাণের ব্যাকুলতা ভগবচ্চরণে নিবেদন করিতেই তাহার সেই অভিনব পন্থা অবলম্বন!

সীবন শিল্পাদিতে উৎকর্ষতা লাভ করিলে বিজলীর খ্যাতি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সীমানা অতিক্রম করিয়া যায়। মুসলমান দর্জ্জি যাহারা তাহার পিত্রালয়ে বা মাতুলালয়ে যাতায়াত করিত তাহাদের তো কথাই নাই, অনেক অপরিচিত দর্জ্জিরাও তাহাদের সঙ্গে সময়ে সময়ে আসিয়া বালিকার নিকট "দরবার" জুড়িয়া দিত—নূতন ধরনের কাট্ ছাটের "মতলব" লইতে। বালিকার প্রস্তুত সাদাসিধা অথচ অভিনব ধরনধারণের পরিচ্ছদাদি দেখিয়া তাহারা বিমোহিত হইত।

প্রচলিত বাংলা প্যাটার্ন্ পুস্তকের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ বিজলীর মনঃপূত না হওয়ায় সে তাহার নিজের 'প্যাটার্ন্' নিজেই করিয়া লয়। তাহারই সাহায্যে সে কার্পেটে লিখিত। এইরূপে লিখিত একখানি কার্পেট কোন বালিকা বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষয়িত্রীর দৃষ্টিপথে পড়ায়, তিনি নিজ ছাত্রীদিগকে সেই প্যাটার্নেরই অনুসরণ করিতে বলেন! পরে তিনি সেই হরফগুলি কোন প্যাটার্ন পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিতে দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে বিজলী হাসিয়া বলে "অন্য নামে দিতে পারেন।" যথার্থ প্যাটার্ন-কারিকার গৌরব এভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে তিনিও সম্মত হন নাই।

বালিকার শিল্প কার্য্যের চরম উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয়, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যুগল-মূর্ত্তির জন্য নানাবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করণে ও তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সজ্জা করণে। ক্ষুদ্র মূর্ত্তির ক্ষুদ্র বেশ, কিন্তু তাহাতে বৃহতের সকলই পরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান। পরিপাটিরূপে বেশ করণই বা কী—দেখিলে চক্ষু আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। বিজলীর হাতে পড়িয়া "শ্রী"র শ্রী অধিকতর বর্দ্ধিত হইত। তাহার 'আল্পনা' দেখিয়া সকলে তাহাতে কাশ্মিরী চারু-শিল্পের পূর্ণ প্রতিকৃতিই দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার অঙ্কন-বিদ্যা সর্ব্বতোভাবে প্রযুক্ত হয়—এই আলিপনাদানে। অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত হস্তিদন্তের মূল্যবান আসবাব বলিয়া তাহা অনেকে ভ্রম করিতেন।

সঙ্গীত ও শিল্প-বিদ্যায়

গানের মধ্যদিয়া বালিকার ভগবদ্ভক্তি ক্রমে যেরূপ বিকশিত হয়, শিল্পবিদ্যানুশীলনেও তাহার সেই ভাব ফুটিয়া উঠে। জামতাড়ায় অবস্থানের শেষাশেষি বিজলী তাহার মাসীমাতার (নীরাদেবী) আগ্রহে চিত্রাদি বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিতে আরম্ভ করে। পাঁচছয়খানি চিত্র জামতাড়ায় বসিয়াই শেষ হয়। "কলা" হিসাবে সেগুলি অতি উচ্চাঙ্গের বলিয়া অভিজ্ঞেরা প্রশংসাবাদ করেন। প্রথম প্রথম বিজলী—'পল্লীবধূ,' 'বাতায়ন-পথে,' 'স্নাত' 'নর্ত্তকী' প্রভৃতি যাহা হাতের কাছে পাইত তাহাই লইয়া কাজ করিতে বসিয়া যাইত। হাত বেশ পাকিয়া আসিলে তাহার নবজলধরশ্যামের বিভিন্ন ভাবের চিত্র সকল লইয়া সে তন্ময় হয়। বেশ-ভূষায় সজ্জিত সেই সকল চিত্র দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা উচ্চকণ্ঠে বলেন, "চিত্রকরের যাহা কল্পনাতেও আসে নাই সজ্জাকারিণী নিজ শিল্পকলায় চক্ষের সম্মুখে তাহা ধরিয়া দিয়াছে।"

গৃহিণীপনায়

ছেলে বেলায় বিজলী যখন ছেলেখেলা করিত, পশুপক্ষীকে আহার করাইত বা ভায়েদের 'এটা-সেটা' করিতে বলিত তাহার একটা শৃঙ্খলাপূর্ণ সংযত ভাবই তখন দেখিতে পাওয়া যাইত। পাঁচবৎসরের কন্যার কাজকর্ম্ম ঝরঝরে তকতকে, কথাবার্ত্তা ধীর, শান্ত অর্থপূর্ণ, আচার শুদ্ধ, ব্যবহার স্বার্থশূন্য, সরল—যথাস্থানে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বালিকা তাহার দায়িত্ব বোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় পদে পদে প্রদান করে। চিত্তের দৃঢ়তা হেতু তাহার বয়সের পক্ষে কঠিন কর্ম্ম করিতে হইলেও কখনো তাহাতে পশ্চাদপদ সে হয় নাই। নয় দশ বৎসরের

বিজলীকে একবার একাই সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম করিতে হয়; পরীক্ষায় সে যে উত্তীর্ণা হয় তাহা ইতঃপূর্ব্বেই পাঠক পাঠিকা অবগত হইয়াছেন। ইহার পরে এক এক করিয়া সাংসারিক সকল কার্য্যের ভার জননীর হস্ত হইতে বিজলী জোর করিয়া গ্রহণ করে। তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্র-মাধুর্য্য কার্য্য-কুশলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার বলে সেই গুরুভার সে অনায়াসে বহন করিতে সক্ষম হয়।

এইভাবে বিজলী যখন সংসারের কর্ত্রী হইল তখন তাহার বয়স প্রায় একাদশ বৎসর। এত কাজের মধ্যেও তাহার অধ্যয়ন, সঙ্গীত ও শিল্পবিদ্যা অনুশীলনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই—অবকাশ তাহার থাকিত যথেষ্টই। তখন তাহার গল্প ও কৌতুকের ঘটা দেখিলে অপরিচিত ব্যক্তি ধারণাও করিতে পারিত না যে এই রঙ্গ-কৌতুকপ্রিয়া বালিকাদ্বারা সংসারের কোনো উপকার হয়।

প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করার অভ্যাস বিজলীর চিরদিনই ছিল। কর্ত্রীর আসনে বসিয়া ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে 'ঠাকুর' প্রণাম করিয়া তাহার দৈনিক কার্য্যের সূচনা হইত, তদবধি নিদ্রাগত পিতা ও সহোদরবর্গের জন্য প্রাতরাশের আয়োজনে শেষ হইত রাত্রি দশ ঘটিকায় শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে দাস দাসীর আহারাদির সংবাদ গ্রহণে ও গৃহদ্বার ও বাতায়নাদি যথাযথ অর্গলাবদ্ধ হইয়াছে কিনা তথ্যগ্রহণে ও প্রয়োজন হইলে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত আদেশ-প্রদানে।

কাজের ইয়ত্তা ছিল না। কেহ কিন্তু জানিতেও পারিত না কখন কাজ হইত। নিজে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া বিজলী দাস দাসীকে পরিশ্রম করাইত। আজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকিত না দাস দাসীরাও শত প্রকারে তাহার দয়ার নিদর্শন প্রাপ্তি হেতু তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সতত তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিত।

পরিবারস্থ প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী আহারের ব্যবস্থাই যথাসম্ভব বিজলী করিয়া দিত। তাহার 'গিন্নিপনার' অত্যাচারে অরুচিকর কিন্তু শরীরের পক্ষে হিতকর সামগ্রীও যে চলিত না তাহা নহে।

সহোদরেরা কিম্বা অন্য কেহ সময়ে আহারাদি না করিলে বালিকার শাসন হইতে পরিত্রাণ পাইত না। সুতরাং যথাকর্ত্তব্য যথাসময়ে করিবার অভ্যাস তাহাদিগকে করিতে হইয়াছে।

সাদাসিধা আহার, পাত্রাদির শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা পরিচ্ছদ, শয্যা ও শয়নকক্ষ প্রভৃতির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সকল দিকেই 'গিন্নীর' তীক্ষ্ণদৃষ্টি। পিতৃবন্ধু বরাট মহাশয় বিজলীর সম্বন্ধে তাহার শৈশবে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, মাত্র স্নেহপরবশ হইয়া তিনি যে তাহা করেন নাই প্রতি কার্য্যে তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়। বিজলীতে "জাত্‌বষ্ঠি" শিশু মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পা'ন। প্রীতি-মমতায় শতপ্রকারে সেই মূর্ত্তির পরিপুষ্টি সাধন করিয়া যখন তাহা কৈশোরে উপনীত হয়, স্নেহবিগলিতা শান্তিরূপিনী জননীজ্ঞানেই রোগ শোক দুঃখ দৈন্য-ক্লিষ্ট নরনারী তাহার শরণাপন্ন হইয়াছে।

সকল ব্যথার ব্যথী হইয়া দীন দরিদ্র আতুরের মুখে হাসি ফুটাইতে স্নেহময়ী সতত তৎপরা! অভুক্তকে অন্ন দিতে, অতিথি অভ্যাগতকে আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করিতে সংসারের কল্যানার্থে—কল্যাণময়ী সতত আগ্রহান্বিতা!

কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ভূষণ করিয়া গৃহস্থের "মর্য্যাদা রক্ষার" দুর্ব্বলতা বিজলীর ছিল না। আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানই এ বিষয়ে তাহার সহায় হয়। কোনো সামগ্রীর কিছুমাত্র অপচয় যাহাতে না ঘটে তাহা নিবারণের প্রয়োজন হইলে কঠোরতা অবলম্বন করিতে সে ইতস্ততঃ করিত

না। স্বভাবতঃ কোমলপ্রাণা বিজলী কর্ত্তব্যের অনুরোধে নিজেকে এমনি করিয়াই ডুবাইয়া রাখিত।

বিজলীর ভাণ্ডারের অপূর্ণতা কোন কালেই ঘটিত না। মাসের শেষাশেষি 'দশ জন' লোক আসিয়া পড়িলেও কোথা হইতে যে সে সব সঙ্কুলান করিয়া দিত তাহা দেখিয়া তাহার জননীও আশ্চর্য্যান্বিতা হইতেন।

পাড়াপ্রতিবেশীরাও বিজলীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা জ্ঞাত থাকায় প্রয়োজনকালে তাহার শরণাপন্ন হইয়া প্রায়ই বিফল মনোরথ হ'ন নাই। না চাহিলেও সময় বিশেষে সে'সকল তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইত।

সীবন শিল্পে তাহার দক্ষতা সংসারের ব্যয়-সংক্ষেপ বিশেষ কার্য্যকরী হয়। ধনীর ব্যবহারোপযোগী শয্যাস্তরণ ও পরিচ্ছদাদি সল্পব্যয়ে নিজ হস্তে প্রস্তুত বালিকা করিয়া রাখিত। কক্ষ-প্রাচীর-গাত্র তাহার শিল্প-সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়া পিতৃগৃহের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া দেয়। সে সকলের সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত, "জননীর দান" শিল্পির গুণপণায় সন্তানকে স্নেহ-করুণা দানে যেন সজীব! পরিচ্ছদ-শোভিত সেই চিত্রের আশে পাশে শিল্পির শিল্প-বৈচিত্র্যের মধুর সমাবেশ—মায়ের দান-সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত!

সংসার তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তরণীর শোচনীয় অবস্থায় পরিশ্রান্ত পিতা যখনই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া নৈরাশ্য-সাগরে ভাসমান, আশার সহস্র প্রদীপ জ্বালাইয়া দৃপ্তা কন্যা তাঁহার হাত ধরিয়া নিজে তরণী রক্ষা করিবার উদ্দীপনায় তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিতে লজ্জা ভয় কিছুই করে নাই। বিজলী সংসারের শ্রী-সৌষ্ঠব এইরূপেই রক্ষা ও বর্দ্ধিত করিতে যত্নবতী হয়। বয়সে সুকুমারী হইলেও আদর্শ-গৃহিণীর সৎসাহসের অভাব তাহার কোনো কালেই হয় নাই।

নিজে পাক করিয়া সকলকে আহার করাইতে বিজলীর বড় আনন্দ হইত। নানাবিধ আমিষ, নিরামিষ, মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণে সে সিদ্ধহস্ত

হয়। সে সকলের বিশেষত্ব সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি অভিজ্ঞ হালুইকর ও ভেন্‌করকেও করিতে হইত। একবার জামতাড়ায় ৪০।৫০ জনের জন্য পাক বিজলী একা করে। সুক্তানি হইতে পায়স্, দধি, মিষ্টান্ন সকলই প্রস্তুত হয়। তৃপ্তির সহিত সেবা করিয়া সকলে যখন জানিতে পারেন যে বিজলীই "অন্নপূর্ণা"রূপে 'সন্তান'দের অন্ন বিতরণ করিয়াছে, তখন স্থানীয় প্রবীন ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্‌সী মহাশয় বিজলীকে ডাকিয়া বলেন "জামতাড়ায় ব'সে কোল্‌কাতাকেও হার মানিয়ে দিলে, তা তুমি দেবে না তো কে দেবে? আমাদের আশীর্ব্বাদের অনেক উঁচুতে তুমি। যাঁর ইচ্ছায় তুমি আমাদের কাছে এসেছো ওপর থেকে তিনিই তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন। মনে মনে তুমি বরং আশীর্ব্বাদ করো তোমার মত অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী সরস্বতী বাংলার ঘরে ঘরে যেন বিরাজ করে।" বৃদ্ধের স্নেহ-বচনে বিজলী সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। বাড়ীর মধ্যে যাইয়াই বলে, "বাবা সব তোমাদের বাড়াবাড়ি।" হাসিয়া আবার বলে, "বুড়োকে আর একদিন খাওয়াতে হ'বে। এমন রাঁধবো—খেয়ে নরকে না পাঠান্ তো কি বলিছি!"

আহার্য্য প্রস্তুত সম্বন্ধে অবশ্য নহে, কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে, সুযোগ পাইলেই, বিজলী রঙ্গ-কৌতুক করিতে ছাড়িত না। তাহাতে কিন্তু তাহাকে 'নরকে' পাঠাইবার কথা কাহারও মনে কখনো উদয় হয় নাই। কৌতুকময়ীর কাণ্ডে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহা উপভোগ করিয়া তাহারা তাহার গুণগানই করিত। সংসার-রঙ্গে বিজলীর অভিনব রঙ্গ সংসার-যাত্রার পথ সুগমই করিয়া দিত। সকল আশা নিভিয়া যাইবার কল্পনায় থর থর কম্পান্বিত সংসারাবদ্ধ জীবের কর্ণকুহরে সুরের লহরে প্রেমময় পরমপুরুষের বাণী ঝঙ্কৃত করিয়া আনন্দ-সাগরে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিবার বিপুল আয়াস—তাহার গৃহিণীপণার শ্রেষ্ঠ

নিদর্শন। শঙ্খধ্বনির সহিত 'সন্ধ্যা দান' করিয়া ভক্তিমতী সেই কার্য্য করিতে বসিত।

শরীর পালনে

বিজলীর পরিচয় এ পর্য্যন্ত যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে তাহার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পাঠক পাঠিকা অনায়াসেই করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। এমন অক্লান্ত কর্ম্মা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ভূতগত পরিশ্রম করিয়াও হাসি তাহার মুখে লাগিয়া থাকিত। সেই হাসির হাওয়ায় ক্লান্তি বুঝি তাহার কাছে 'ঘেঁসিতে' পারিত না।। পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিবার সৌভাগ্য না ঘটিলে যে ইহা সম্ভবপর নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

মাতৃক্রোড়ে বিজলীর স্বাস্থ্য বিশেষ সন্তোষজনক বলিয়া পরিগণিত হয়। শৈশবে, বাল্যে তাহার স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। খেলা-ধূলা করিবার সময়ে বা পথে ঘাটে অটুট্-স্বাস্থ্য সম্পন্না কমনীয়া এই বালিকাকে দেখিয়া নির্ণিমেষ-লোচনে দর্শক তাহার পানে চাহিয়া থাকিত—চক্ষু ফিরাইতে পারিত না। বয়সাধিক গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা বিজলীর শক্তির পরিচয়ে লোকে চমৎকৃত হইত। তাহাকে আদর সোহাগ করিবার লোভ তাহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

"শরীরং ব্যাধি মন্দিরং"—এ বাক্য বালিকা তাহার জীবনে একপ্রকার নিষ্ফল করিয়া দেয়। তাহার নীরোগ দেহ, সুডৌল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্বচ্ছ কমনীয়তা ও মধুর হাসির সংমিশ্রণে যে শ্রী ধীরে ধীরে সে ফুটাইয়া তুলে, সেই দীপ্তিময়ী মূর্ত্তির পূত অঙ্গস্পর্শ করিবার দুঃসাহস রোগ ব্যাধির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। মরজগতের বীজাণু-অনুসন্ধিৎসুগণ

রোগাক্রমণে বালিকার বাধা দিবার শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত। নিয়মিত অভ্যাসে অভ্যস্তা বলিয়া বিজলী অটুট্ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ইহা অনেকেই মনে করিতেন। কাহারও কাহারও মতে শুদ্ধাচার ও প্রফুল্লতাই তাহার শরীর পালনের অব্যর্থ প্রকরণ ! নানা লোকের নানা কথা। সে যাহা হউক ভগবদেচ্ছায় ইহজগতে তাহাকে রোগ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কালে ভদ্রে সামান্য অসুস্থতা ভিন্ন অন্য কোনো উপসর্গ তাহাকে ত্যক্ত করিতে পারে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সামান্য অসুস্থতাতেও বিজলী বিশেষ কাতর হইয়া পড়িত। চক্ষের জল তখন কিছুতেই রোধ করিতে সে পারিত না। রোগের উৎপত্তি পাপে। শুদ্ধচেতা বালিকা নয়ন-জলে তাহার অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত কিনা কে জানে ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে জ্ঞানকৃত পাপ-জনিত শারীরিক গ্লানি সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। আমের সময় আম তাহার সহ্য হয় না জানিয়া শুনিয়াও তাহার লোভ সে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এই কারণে সে সময়ে অল্প অসুখ বিসুখ হইতই। তাহাতে সে দৃক্‌পাত করিত না।

মাছ মাংসের অপেক্ষা শাক-ভাত ও ফলপাকড়েই রুচি তাহার অধিক ছিল। জলযোগের সময়ে ফল ছানা ও দুধ ভিন্ন অন্য কিছু বড় একটা সে খাইতে চাহিত না। নিত্যস্নান, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাদাসিধা আহার, যথাসময়ে বিশ্রাম ও নিদ্রা এবং পর্য্যাপ্ত খেলা ধূলা তাহার চাই-ই।

সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সচ্চিন্তা ও সদানন্দভাব তাহার মানসিক শক্তির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল। জ্ঞান-ভক্তি যোগে তাহা অধিকতর শোভনীয় করিয়া দিয়া কর্ম্মপথে তাহার গতি ফিরাইতে অনায়াসে সে সক্ষম হয়। আধি-ব্যাধির প্রবেশাধিকার যে সে স্থানে একেবারেই নাই।

ধুমধাম করিয়া শরীর পালনের রীতি নীতি অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা

করা বিজলীর কোষ্ঠিতে লিখে নাই। দিনের পরে রাত্রি আর রাত্রির পরে দিন যেমন আসে জন্মাবধি তাহার প্রতি কার্য্য আপনা হইতে তেমনি নিয়মিত হইয়া যায়।

সামাজিকতায়

শৈশবে ও বাল্যে বিজলীর খেলার সাথীরা ও সখীগণ তাহাকে পাইলে আর কিছু চাহিত না। আত্মীয় ও অন্তরঙ্গেরা তাহার আগমনে নিজ নিজ গৃহ উৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত করিতেন। হাসি গান গল্পে বালিকা আনন্দের বন্যা বহাইয়া দিত। উৎসব শেষে সকলে বার বার তাহাকে বলিয়া দিত, "শিগ্‌গির আবার এসো।" না যাইলে বাড়ী বহিয়া তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিতে কেহ কেহ আসিত। ঝগড়া-ঝাটি শেষ করিয়া তাহারা শাসাইয়া যাইত "এমন করলে আর আসবো না।"

পিতৃগৃহে বা অন্যত্র দশের সম্মুখে বিজলী কথায় কথা কহিত না—কথা হইত তাহার হাসিতে। কথা যদি দুই একটা বলিয়া ফেলিত—সে তাহার স্বভাবের ব্যতিক্রমে। কথার পর কথা, কত কথা লোকে বলিয়া যাইত; স্থির ধীর ভাবে মুখে হাসি ফুটাইয়া বালিকা সকল কথাই শুনিত। প্রয়োজন হইলে তাহারই মাঝে সেই হাসি দিয়া তাহার যাহা বলিবার সে বলিয়া লইত।

কলিকাতা এবং কলিকাতার বাহিরে নানাধর্ম্মাবলম্বী নানাজাতির লোকের সহিত মেলামেশা করিবার সুযোগ বিজলী বাল্যকাল হইতেই প্রাপ্ত হয়। বেহারী সাব্‌-ডেপুটি মিষ্টার লাল্, ব্যারিষ্টার মিষ্টার্ রসুল্, ম্যাডান্ সাহেবের পরিবারবর্গ সকলেই বিজলীর আদর অভ্যর্থনায় এতদূর আপ্যায়িত বোধ করিতেন যে সুযোগ ঘটিলেই সাগ্রহে তাহার সংবাদাদি লইয়া তবে অন্য কথা পাড়িতেন।

সামাজিকতায়

কলিকাতা ও পাটনার যশস্বী ও প্রবীণ ব্যারিষ্টার মিষ্টার্ কে, বি, দত্ত ও তাঁহার বিদূষী কন্যাদ্বয়ের সহিত জামতাড়ার বাটীতে কোন সামাজিক উৎসব উপলক্ষে বিজলীর দেখা সাক্ষাৎ হয়। দত্ত মহাশয় ইহার পর যখনি তাহার পিতাকে পত্র লিখিয়াছেন বা তাহার কোন আত্মীয়ের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে সর্ব্বাগ্রে বিজলীর নাম উল্লেখ করিয়া তিনি তাহার সংবাদ লইয়াছেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও তাঁহার পত্নী সেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতেই সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিজলীর সৌজন্য ও আতিথেয়তায় মিসেস্ নেলী সেনগুপ্ত পাশ্চাত্য আদর্শ অতিথিসৎকারের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া চমৎকৃতা হন। অভ্যর্থনার আয়োজন ও আদর-আপ্যায়ন হয় কিন্তু সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে। দত্ত সাহেবের কন্যাদ্বয়কে বিজলী একদণ্ডেই আপনার করিয়া লয়।

ইহার পরে সহোদরদিগের উৎসাহে জামতাড়ার বাটীর মাঠে টেনিস্ প্রতিযোগিতা উপলক্ষে স্থানীয় আপামর সাধারণ আহূত হইলে কিশোরী বিজলী দ্বিধাশূন্য চিত্তে মাঠে বসিয়া খেলা দেখে এবং খেলা হইয়া যাইলে সমাদরের সহিত অতিথি সৎকার করিয়া সকলকে বিদায় দান করে। হিন্দু-কন্যা হইয়াও এই সকল সামাজিক ব্যাপারে দশের সম্মুখে দাঁড়াইতে সে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করিত না। তাহার তখনকার বেশভূষার পারিপাট্যে হাল্ ফ্যাসানের ছাপ মারা থাকিলেও তাহার মধ্যে এমন একটা কমনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিত যাহাতে লোকের মনে স্বতই সম্ভ্রম বা বাৎসল্যের ভাবই জাগিয়া উঠিত। সহাস্য-বদনে নয়ন কোণে একটা অপার্থিব দীপ্তি ফুটাইয়া স্বচ্ছন্দগতিতে কিশোরী সহস্রের মাঝে দেববালার ন্যায় বিচরণ করিয়াছে! তাহার আবির্ভাবে সকলের প্রাণে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। সুবিমল আনন্দে দশদিক যেন মুখরিত হইয়া উঠিত!

উৎসবাদি উপলক্ষে মধুর-দর্শন, প্রিয়বাদিনী, সঙ্গীত-কুশলা চিরানন্দময়ী এই কন্যার উপস্থিতি আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতবর্গের নিকটে ক্রমে অপরিহার্য্য হয়। সে না থাকিলে শত লোকের আনন্দ-কোলাহলেও উৎসব যেন প্রাণহীন, তাঁহাদের মনে হইত। ভূমিষ্ঠা হইয়াই সকলের প্রাণে বিজলী তাহার বৈশিষ্ট্যের যে রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়, দিনে দিনে তাহা বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সে শোভা সে সৌন্দর্য্যের তুলনায় অপর সকলই যে তাহাদের নিকট তুচ্ছ !

বিজলীর মাতামহ তাহার গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। দৌহিত্রীকে নিজ গৃহে পাইলে গান শুনিবার লোভে সময়ে সময়ে "ডাক্"ফিরাইয়া তিনি দিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট সন্ধ্যার পর যাওয়া তাঁহার ছিল একটা নিয়ম। গান শুনিতে বসিয়া সে নিয়মের ব্যতিক্রম ও বহুবার ঘটে। মাতামহের সেই সমাদরের প্রতিদানে বিজলী যেন তাঁহার মন বুঝিয়া গান গাহিত—কি গান সে গাহিবে তাঁহাকে বলিতে হইত না। গান শুনিয়া আহারাদি তিনি করিতে বসিলে পরিবেষণ কার্য্যের ভার সে দিন দৌহিত্রীর উপর। বিজলীর 'ফল ছাড়ান,' 'পাত সাজান' তিনি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন। তাহা দেখিতে দেখিতে কী যেন তাঁহার মনে পড়িয়া যাইত। স্মৃতির উত্তেজনায় ঈষৎ চঞ্চলও বুঝি হইয়া পড়িতেন তিনি। নিজেকে সামলাইয়া দৌহিত্রীকে রঙ্গ করিয়া তখন তিনি বলিতেন "তোকে যখন ক'নে দেখতে আসবে বলিস্—ছাখ্ ছাখ্ আমার চোখ ছাখ্।" রঙ্গ করিয়া তিনি সে কথা বলিতেন বটে কিন্তু সে তাঁহার রঙ্গ নহে। "এ চোখের জোড়া আর কোথাও দেখেছি মনে পড়ে না"—এ কথা অনেকবার নিজ কন্যাকে তিনি বলিয়াছেন। মাতামহের রঙ্গে দৌহিত্রী তাঁহার সেই প্রশংসিত নয়নযুগল এমন সরল হাসিতে ভরিয়া দিত যে রঙ্গকারী উচ্চকণ্ঠে হাস্য

ডাক্তার কেদার নাথ দাস
এম্ ডি, সি আই ই

করিয়া উঠিতেন পরিহাসের পাত্রী বটে !!! বিজলীর শিশুকালে তাহার জননী যে ভাবে তাহাকে সাজাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন তাহার এতটুকু এদিক ওদিক হইলে কন্যা নিজে তাহাতে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহা সংশোধন করাইয়া লইত। মাতামহী তাহাতে বলিতেন "বাবা, মেয়ে হবে কি গো ?" মাতামহ সস্নেহে বলিতেন "মেম্ হবে, আর মেম্-সাহেবে মোটরে রোজ হাওয়া খেতে যাওয়া যাবে।" মোটরে হাওয়া-খাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে বটে, কিন্তু সাহেবের অঙ্গে ধুতি উড়ানি ! মেমের বেশ দেখিয়া লোকে বলিত লক্ষ্মী-প্রতিমা !

প্রতিমা সদৃশ ৭।৮ বৎসরের বিজলী যখন মেসপটেমিয়া-যাত্রী বাঙ্গালী পল্টনের বিদায়-অভ্যর্থনা কালে পিতার নিকটে দাঁড়াইয়া প্রফুল্লবদনে তাহাদের জয় কামনা করে এবং বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী সেই বীর বালকেরা তাহাকে তাহাদের জয়শ্রীজ্ঞানে আনন্দে উচ্চকণ্ঠ হয় তখন বালিকার নয়নে বদনে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতির বিকাশে দর্শকবৃন্দ তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। পরদিন ডাক্তার শরচ্চন্দ্র মল্লিক বিজলীর পিতাকে লেখেন, "*Thanks for the very hearty farewell reception yesterday to the boys * * It was a sight for the Gods when your sweet little daughter moved angel-like pouring blessings * * * * * **"

বিজলীর জ্যেষ্ঠতাত ডাক্তার সত্যপ্রসাদ বাড়ীর মেয়েদের গান গাওয়ার বিরোধী ছিলেন। তাহার গান শুনিয়া তিনি তাঁহার দৌহিত্রী কন্যাকে গান শিখাইবার জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ভার লইতে বলেন। জ্যেষ্ঠতাত পত্নী ও পুত্রবধূ উভয়কেই বিজলী মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিত। ভাঁড়ারে ঢুকিয়া, রান্নাঘরে লুচি বেলিতে বসিয়া; বৌদিদিকে বিরক্ত করিয়া তালতলার বাড়ীতে একদণ্ডে যেন দোল দুর্গোৎসবের কাণ্ড করিত।

বেশীদিন দেখাশুনা না হইলে বিজলীকে দেখিতে 'বড়মা' ছুটিয়া আসিতেন- পুরস্কার দানের অভিপ্রায়ে বোধ হয় জলযোগ তাঁহাকে না করাইয়া বিজলী ছাড়িত না। উভয়ের মধ্যে সে কী কলহ! বড়মা বলিতেন আস্পদ্দা তোর তো কম নয়! আমি কোথাও খাই?" বিজলী হাসিয়া বলিত "ব'সনা বড়মা।" বিজলীর অত্যাচার সহ্য তাঁহাকে করিতে হইয়াছে।

বিজলীর বড় পিসিমার জ্যেষ্ঠ জামাতা (শ্রীযুক্ত করুণাময় বসু. এম্ এ বি এল্, ঠাকুর্-ল-প্রফেস্‌র) একদিন বিজলীর গান শুনিতে আসে। জ্যেষ্ঠপুত্র ও একটী কন্যা হারাইয়া শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাহার তখন বড় ভাল ছিল না। এসকল কথা বিজলী সবিশেষ জানিত না। ভগ্নী- পতির নীরস উচ্চ হাসি ও আয়ত নিস্প্রভ চক্ষু দেখিয়া তাহার মনের অবস্থা কতকটা আঁচিয়া লইতে কিন্তু তাহার বিলম্ব হয় নাই। সে গান ধরে :—

"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ"—

গর্ব্ব করিতে চূর"

গান শেষ করিয়া গায়িকা দেখে শ্রোতার চক্ষে জল। করুণকণ্ঠে করুণা বলে, "এ গান শুনেছি অনেকবার কিন্তু এ যে এমন্ এর আগে তা বুঝ্‌তে পারিনি। এমন্ করে গাইতে তুমি কি ক'রে শিখলে?" প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকারী নিজেই সঙ্গে সঙ্গে দেয়, 'না, এ কেউ শেখাতে পারে না, আপ্‌নি শেখে।"

একবার গুরুজনবর্গকে বিজয়ার প্রণাম করিয়া বাটী ফিরিবার পথে বিজলী পিতাকে বলে "বেদ বেদান্ত নিয়েই নতুন্ জ্যাঠা বোধ হয় থাকেন বাগে পেলে ভুদিনে সব আমি ঘুরিয়ে দি।" পিতা জিজ্ঞাসা করেন "কি ক'রে রে?" "কেন যে পেটুক্, রোজ্ গোটাকতক দরবেশ আর লেডি- ক্যানিং ক'রে খাইয়ে" বলিয়াই উচ্চহাস্য। নিজ পুত্রকন্যাদ্বারা স্তব স্তোত্র, পদাবলী প্রভৃতি আবৃত্তি করাইয়া পঞ্চম জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতুষ্পুত্রীর

বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হইলে তাঁহার সকল উদ্যমই স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসিতে বালিকা বিফল করিয়া দিয়াছে। ইহার অল্পদিন পরে জ্যেষ্ঠতাতের বাটীতে বিজলী একদিন গান গাহিতেছিল এমন সময়ে তাহার পঞ্চম জ্যেষ্ঠতাত, মিষ্টার এন্, এল্, দের সহিত সেস্থানে উপস্থিত হ'ন। যে গান বিজলী গাহিতেছিল তাহা শেষ করিয়া আরও তিনখানি গান পরে পরে সে গায়; যথা—"শঙ্কর দেব মহাদেও," "সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী।" ইহার পরে জ্যেষ্ঠতাত বলেন, "একটা কীর্ত্তন গা।" বিজলী গাহে 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি।' আঁকরের পর আঁকর দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিজলী যখন সে গান শেষ করে, এন্, এল্. দে বলেন, "বাঃ এতো চমৎকার!" পঞ্চম জ্যেষ্ঠতাত বিজলীর দিকে চাহিয়া বলেন, "হুঁ।"

জ্ঞানের বা বিদ্যার পরীক্ষা বিজলী এমনি করিয়াই দিত। তাহার পরিচয় সে প্রদান করিত—কাজে, কথায় নহে। নিজের রচিত অনেক গান সে গাহিত কাহাকেও কিন্তু সে বলিত না যে সে'গুলি তাহারই রচিত। গান শুনিয়া রচয়িতা বা রচয়িত্রীর নাম যদি কেহ জানিতে চাহিত বিজলী বলিত, "ও একটা নতুন গান।" টাউন্‌হলে, মনোমোহন ও মিনার্ভা থিয়েটারে বাঙ্গালী-পণ্টনের বিদায়-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে বিজলীর পিতা একটী গান রচনা করিয়া দেন এবং সেটী সে সকল স্থানে গীত হয়। সেই গানের সমালোচনা করিয়া 'নব্যভারত' সম্পাদক বলেন যে আর কখনো কিছু না লিখিলেও এই একটি গানই তাঁহাকে যশস্বী করিয়া রাখিবে। বিজলীর ইহা জানাছিল না। বহুকাল পরে দেখা যায় উচ্চ প্রশংসিত সেই গানের কথা কাটিয়া ছাঁটিয়া বিজলী তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। নব্যভারতের সেই সম্পাদক তখন ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। থাকিলে গানের নূতন রূপ দেখিয়া তাঁহার মত

পরিবর্ত্তন করিতেই হইত। বিজলীর 'বিদ্যা ধরা পড়ায়' সে হাসিয়া পলাইয়া যায়। পরে কোথাও ইহার উল্লেখ কেহ করিলে তখনকার মত 'অজ্ঞাতবাসই' সে অবলম্বন করিত। ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় বিজলীকে যোগদান করাইবার জন্য প্রফেসর্‌ কেরামৎউল্লাখাঁ সাহেব বৃথাই তাহার সাধ্যসাধনা করেন। বিশিষ্টব্যক্তিবর্গের নির্ব্বন্ধাতিশয্যেও কংগ্রেস্‌ ও অন্যান্য প্রদর্শনীতে নিজ কৃত শিল্পদ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেও বিজলী কখনো সম্মত হয় নাই। "জনৈক হিন্দুমহিলা" নাম দিয়া বিজলীর জননী কয়েকটী শিল্প দ্রব্য কৃষি-শিল্প-বানিজ্য প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন এবং সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত হ'ন। বড় হইয়া বিজলী যখন এ কথা জানিতে পারে তখন জননীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া কী হাসি রঙ্গই না সে করিয়াছিল। জননী তাহাতে বলেন "দেখবো তুইও পাঠাস্‌ কিনা।" বিজলী স্থির কণ্ঠে বলে, "দেখো।"

সীবন-শিল্পাদিতে অভিজ্ঞা কত নারী তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। সামাজিক উৎসবাদি উপলক্ষে বিজলীর সুরলহরীতে আকাশ-বাতাস মধুময় হইয়া যশস্বিনী গায়িকাবর্গকে আনন্দ-পুলকিত করিয়াছে। সে গানের পরে আর কাহারও গান বড় একটা জমিতনা। প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করার বিরোধিনী সে কিন্তু চিরদিনই ছিল। মধ্যম জ্যেষ্ঠতাতের বাটীতে যাইয়া ঠাকুর ঘরে ঠাকুর প্রণাম-করিয়া বিজলী, রোগ-ক্লিষ্ট 'মেনোদাদার' নিকট উপস্থিত হইত। মেনোদাদা (নির্ম্মল) তাহাকে বলিত, "গানে খুব ওস্তাদ তুমি হয়েছ শুনতে পাই, আমাকে তো কখনো শোনালে না।" জবাব দিবার কিছু আছে কিন্তু না দেওয়াই ভাল— ভাবিয়া লোকে যে হাসি হাসে, নির্ম্মলের অভিযোগে আত্মসমর্থনের কোনো চেষ্টা না করিয়া বিজলী কেবল সেই হাসিই হাসিত, অভিযোক্তা তাহাতে অপরাধ স্বীকার করাইয়া লইবার পথ খুঁজিয়া

পাইত না। স্ব-রচিত একখানি 'মেঘ' বিজলীকে একদিন পাঠাইয়া দিয়া নির্ম্মল লিখিয়া দেয়, "এখানা আমায় শোনাতে হবে।" এই জাতীয় রাগিনী তাহার 'চক্ষুশূল'। তাহা গাহিবার সময়ে—'গভীর মেঘগরজনে' গায়িকা যেমন ত্রস্তা হইত, 'বিজলী চমকে' শ্রোতাও তেমনি বিজলীর "মিনতি-বেদনা-আঁকা" নয়নযুগল দেখিয়া তাহার 'পরাণ পুটে' লীলায়িত একটা করুণ সুর প্রত্যক্ষ করতঃ ব্যাথা বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িত। এমন গান গাহিতে বিজলী তাই সম্মত হইত না। মেনোদাদার 'মেঘ' এর কোল হইতেও বিজলী সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়—তাহাকে অন্যান্য রাগিনী শুনাইতে প্রতিশ্রুতি দান করে।

একবার বিজলীর 'নতুন মা' (পঞ্চম জ্যেষ্ঠতাত পত্নী) বেশ একটু সাজ-সজ্জা করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলেন "গান আমি বুঝতে পারি, গেয়ে দেখ।" 'নতুনমার' রঙ্গ বিজলী বেশই উপভোগ করে। সে গান ধরে ঃ—

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনা তোমারে—"

গান শেষে অপদস্থার মত 'নতুন মা'র' অবস্থান। বিজলী তখন হাস্যমুখী। 'সর্ব্বজয়ার' পরাভবে জেতার নয়ন-কোনে কী কৌতুক রঙ্গ!

কৈশোরেও দশের সম্মুখে বিজলী স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করিয়াছে। সেই কারণে তাহার পরিচিতাদিগের মধ্যে পর্দ্দাবিরোধিনী যাঁহারা তাঁহারা তাহাকে তাঁহাদেরই একজন মনে করিতেন। মিস্ মেয়োর্ প্রসঙ্গ উথাপন করিয়া একদিন তাঁহারা নানা কথা বলেন। তাহাতে বিজলী বলে, "কে একজন্ মেম্সাহেব না বলেছিলেন যে পৃথিবীতে স্বর্গ যদি থাকে তো আছে এক ভারতবর্ষে—হিন্দুর ঘরে, আর নারী সেই স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী?" বিজলীর কথায় আলোচনা বেশ জমিয়াই যায়।

সে তখন বলে, "শুনি তীর্থে গিয়ে যে যা দেখ্‌তে চায়, সে তাই দেখ্‌তে পায়। চাওয়ার দোষ থাকৃতে পারে কিন্তু চাইবার মত চাইলে যে তাই সে পাবে।" আরও সে বলে, "মিস্ মেয়োরই কি সব দোষ! এর খোরাক্ এতদিন ধরে যুগিয়েছে তাকে কে—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অতিরঞ্জিত ছবি এঁকে আমরাই নয় কি?" কথায় কথায় পর্দ্দাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বিজলী বলে, "জল, বাতাস, রোদ্দুরের মত একটা পর্দ্দার প্রয়োজনতা কোনো দেশে কোনো সমাজে কেহই কখনো কাটিয়ে উঠ্‌তে পা'রবে না, মুখে যে যাই বলুন।" মতের মিল হউক আর নাই হউক সেই দিন হইতে অধিকতর প্রীতির চক্ষে বিজলীকে তাঁহারা দেখিতেন।

নিমন্ত্রন-বাটীতে সামাজিকতা রক্ষার পরে গৃহে ফিরিয়া আতিথেয়তার কোনো প্রকার নিন্দাবাদ বিজলীর মুখে কেহ কখনো শুনে নাই। পিতৃগৃহে লোক-সমাগমে সকলের আদর আপ্যায়ণের আয়োজন করিয়া দিতে বিজলী 'ব্যস্ত-সমস্ত' হইয়া পড়িত। ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে বিজলীর সকলের প্রতি সমান সমাদর! মূর্ত্তি বহু— দেবতা যে এক, বিজলী ইহা মনে প্রাণে জানিত।

স্বধর্ম্ম ও দেশানুরাগে

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ বিজলীকে জড়ীভূত করিতে কোনো কালেই পারে নাই। রীতি-নীতিতে সে প্রতীচ্য ভাবেরই ভাবিনী হয়। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মে অনুরাগের পরিচয় পদে পদে সে প্রদান করে। বাঙ্গালীর 'বারোমাসে তের পার্ব্বণের' সাধ্যমত আয়োজন করিতে সে বিশেষ আগ্রহান্বিতা হয়।

স্বধর্ম্মে আস্থা ছিল বলিয়াই অপরাপর ধর্ম্মমত অশ্রদ্ধার চক্ষে দৃষ্টি করা দূরে থাউক সে, সে সকলের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ মতামত পর্য্যন্ত প্রকাশ করিত না। শ্যায়ামআলী মিস্ত্রীর 'রোজার' পর তাহার আহারাদির

আয়োজন সে স্বহস্তে করিয়া দিয়াছে! আহারাদি করিয়া শ্যামাম্আলী মালীর (বিজলীর) নিকট খোদাতালার কত 'কিস্মত' বলিয়া গিয়াছে, শ্রোতাও চক্ষু মুদিয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছে। জামতাড়া মিশনের পাদ্রী ও মেম্ সাহেবেরা জামতাড়ার বাটীতে সুযোগ পাইলেই ধর্ম্মকথা শুনাইতেন। এক দিনের জন্যও একটা বিদ্রোহের বাণী বিজলীর মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। তাঁহারা বিজলীর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উদারতা দর্শনে চমৎকৃত হ'ন। উচ্চস্তরের সীবন শিল্পাদি শিক্ষার্থ বিজলীর শিষ্যত্ব, মেম্সাহেবেরা দ্বিধা-শূন্য হৃদয়ে গ্রহণ করেন।

বালিকা নানা জাতির নানা শ্রেণীর ভাব গ্রহণে যে আদর্শের অনুসরণ করিত তাহা গৃহীত হইলে পৃথিবীতে অনেক দ্বন্দ্ব-কোলাহলের অবসান বোধ হয় হয়। দেশ কাল পাত্রানুযায়ী আচার ব্যবহারই তাহার নীতি, পরার্থই তাহার ধর্ম্ম—বেদ, বেদান্ত, বাইবেল্, কোরাণের কূট-তর্কের ইহার মধ্যে স্থান কোথায়?

পরধর্ম্মে উদারতাই বিজলীর স্বধর্ম্মে অনুরাগ বৃদ্ধি করে। জ্যোতিতে পূজা-গৃহ উছলিত—দূর হইতে ইহা দেখিয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীও চমকিত হইয়াছে। প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজায় নিযুক্তা বালিকা ভক্তিভরে পূজাপাঠাদি অন্তে নিপুণ হস্তে দেবীর আরত্রিক সমাপন করিয়া গললগ্নী-কৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন প্রণাম করিত তখন তাহার উৎফুল্ল তন্ময়তায় দর্শকবৃন্দ রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছে! তাহাদের মনে হইয়াছে দশদিক আলো করিয়া শক্তি স্বয়ং যেন পূজারিণীর অঙ্গ সস্নেহে স্পর্শ করতঃ সহাস্যে বলিতেছেন, "কে কাহার পূজা করে, কে কাহাকে প্রণাম করে।"

অহর্নিশি সদাচার-পালন ও সদ্ভাব-অবলম্বন যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ইহা বালিকার ধ্রুব বিশ্বাস হয়। অনাচারিতার ফলে রাজা নল কলির কোপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন নাই। চারিদিকে অনাচারের তাণ্ডব-

লীলা দর্শনে বিষাদিতা বালিকা তাই কল্পনা করিতে পারিত না যে গৃহ, দ্বার, দেহ, মন পুরীষে আবৃত রাখিয়া সাধারণ চিকিৎসকের উদর পূর্ণ করতঃ কলির প্রকোপ হইতে অপরাধীর অব্যাহতি-লাভ আদৌ সম্ভবপর ! বিষপানে মৃত্যুই স্বাভাবিক। দ্যূতক্রীড়া যখন যুধিষ্ঠিরের ও ধর্ম্মহানিকর ব্যসন, বালী বধ যখন শ্রীরামচন্দ্রেরও অপযশস্কর তখন কোন্ সাহসে সামান্য মর্ত্ত্যের জীব সর্ব্বাঙ্গে কলুষ লেপন করিয়া ধ্বংশ-বিমুখ হইবার আশা করে ? ঋষিবাক্য পালনই যে জীবের সুখ-সৌভাগ্যের একমাত্র সোপান তাহা বালিকা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিত।

জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ-বন্ধন যে স্বধর্ম্মাচরণ পাশ্চাত্য-ভাব প্রণোদিত হইয়া তাহা বিস্মৃত হইলেও ইহার সত্যতা অপ্রমাণিত হয় না। রাণাপ্রতাপের ন্যায় স্বার্থত্যাগী, শিবাজীর মত সন্ন্যাসী, প্রতাপাদিত্যের মত কর্ম্মীও, ধর্ম্ম-শিথিল জাতিকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইতিহাস পাঠে বালিকার বদ্ধমূল ধারণা হয় যে স্বধর্ম্ম পালনেই জাতীয়তার পুষ্টি সাধন হয়—তাহার বিদ্রোহাচরণে জাতির ধ্বংশ হয়।

'সর্ব্বভূতে নারায়ণ'—এই ঋষিবাক্য যে বিজলী কিরূপ উপলব্ধি করিয়াছিল তাহার একটি ঘটনা এই :—সরস্বতী পূজার সময়ে পিতৃগৃহে নিযুক্ত মোহনধাঙ্গড় 'দিদিমণির' নিকট প্রতিমা দেখিবার বাসনা প্রকাশ করে। বালিকা তাহাকে স্নান করিতে বলিয়া তাহার স্নানান্তে স্বচ্ছন্দে তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার সে সাধ পূর্ণ করে।

জামতাড়া বাসকালে বিজলী লক্ষ্য করে যে নীচ জাতীয় ভৃত্য (গিরীশ) প্রচলিত প্রথামত মনিবের নিকট হইতে বিশ হস্ত দূরে দণ্ডায়মান থাকে। বালিকার মনে হয় যে 'অস্পৃশ্য' জাতির বলিয়াই সে এইরূপ করে। গিরীশের এই সঙ্কোচভাব দূর করিতে বিজলী বদ্ধপরিকর হয় এবং অতি শীঘ্র তাহাতে সফলতা সে লাভ করে। অস্পৃশ্য জাতির বালক হরিয়াকে

জননীর স্নেহে কোলে তুলিয়া লইতেও বিজলী পশ্চাৎপদ হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্রের গুহক চণ্ডালকে কোল-দান যে তাহার অবিদিত ছিল না।

পিতাপুত্রীর মধ্যে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে 'আবহমানকাল প্রথার' কথা যখন উঠে বিজলী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে "পণপ্রথাও তো আবহমানকালের প্রথা হ'তে বসেছে, তবে ?" সে আরও বলে, "হ'তে পারে অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে কোনো কালে কঠোরতার প্রয়োজন হয়েছিল। সে প্রয়োজনীয়তা এখনও আছে কিনা তার বিচার ক'রে দেখা উচিত নয় কি ? বিশেষতঃ যখন স্পৃশ্যদের মধ্যে প্রায় সকলে আচারে ব্যবহারে অস্পৃশ্যদেরও অধম হ'য়ে পড়েছে— কারও তা নিবারণ করার ক্ষমতা নেই ?" শেষে বলে, "একথা মন্দ নয় যে পারে পৈতে নেবে, বেদ পড়বে কিন্তু এখনকার অস্পৃশ্যকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাক্‌তে হবে—হ্যাঁ বাবা বল্‌তে পার, আমাদের বংশে বাহাত্তরে-ঘরের মেয়েও সব এসে পড়েছেন কেমন ক'রে ? যাঁরা এনেছিলেন তাঁরা বুঝি বড় বোকা ?"

বাঙ্গালীর মেয়ে অল্প কারণেই গৃহস্থের অমঙ্গলের ভয়ে কাঁটা হয়। অস্পৃশ্যের প্রতি অবিচার হেতু বিজলীর বিচলিতা হওয়া সুতরাং স্বাভাবিক। গৃহস্থের মঙ্গলেই সমাজের মঙ্গল আর সমাজের মঙ্গলেই যে দেশের মঙ্গল। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক দেশ প্রীতির এই ছায়া তাহার হৃদয়ে পতিত হয়। শিল্পে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেই অর্জ্জিত বিদ্যা আত্মীয়া, সখী ও প্রতিবেশী কন্যাদিগকে সে অকাতরে দান করে। ইহার ফলে বহু বালিকা উপার্জ্জনের পথ পাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। হৈ হৈ করিয়া সূতা কাটিবার বহু পূর্ব্বে বিজলী স্বহস্তে সূতা কাটিয়া তাহা তাহার বয়ন কার্য্যে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। খদ্দরে দেশবাসীর অনুরক্তি দেখিয়া ভবিষ্যতে ঢাকার সেই বিশ্ববিশ্রুত মস্‌লিনের পুনরভ্যুত্থান সম্ভাবনায় বালিকা আনন্দে আত্মহারা হয়।

ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা কোনকালেই সর্ব্বান্তঃকরণে সে সমর্থন করিতে পারে নাই। ঘরে ঘরে মাতা, ভগিনী জায়ার সনাতন আসন গ্রহণে কাল বিলম্ব হইলে প্রলয়ের হুহুঙ্কারে যে সকল গৃহই ভাঙ্গিয়া পড়িবে সে সম্বন্ধে বালিকা নিঃসন্দেহ হয়। সেই কারণেই তাহার ক্ষুদ্র শক্তির প্রয়োগে পূজা, পার্ব্বণে, উৎসব অনুষ্ঠানে সে মত্ত হয় কিনা কে জানে! স্বধর্ম্মে ঔদাসীন্য সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিতে ইহা বুঝি তাহার নীরব সাধনা!

বাংলার অনুষ্ঠানে ও বাঙ্গালীর গৌরবে বিজলীর আনন্দের সীমা থাকিত না। মহাযুদ্ধের সময়ে তাহার চতুর্থ জ্যেষ্ঠতাতের বঙ্গীয় সেবা-বাহিনী ও পিতা ও পিতৃবন্ধুদিগের সহযোগিতায় ডাক্তার শরচ্চন্দ্র মল্লিকের বাঙ্গালী-সৈন্য গঠনকালে বিজলী নিতান্ত বালিকা হইলেও তাহার উৎসাহ তাহার বয়ক্রমকে অতিক্রম করে। পূর্ব্ব এক পরিচ্ছদে ডাক্তার মল্লিকের উদ্ধৃত পত্র হইতে বিজলীর উৎসাহের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাঠক পাঠিকা প্রাপ্ত হইবেন। এই সময়েই প্রফেসর্ মন্মথমোহন বসুর সহযোগিতায় বিজলীর পিতা বাংলা নববর্ষারম্ভ উৎসব সমারোহের সহিত জনসাধারণ কর্ত্তৃক সম্পাদন করাইবার উদ্যোগ-আয়োজন করেন। ৺স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ৺যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনী) স্যার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্যার্ ডি আর্কি লিণ্ড্‌জে শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র বড়াল, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘটক (হাইকোর্টের মাষ্টার) ৺কুমার মণীন্দ্রনাথ সিংহ (পাইকপাড়া) ৺স্যার্ আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির আনুকূল্যে নববর্ষারম্ভ উৎসব সুসম্পন্ন হয়। বিজলীর অনুপ্রেরণাই এই উৎসব আয়োজনের মূল।

৺ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের সেই কুঁড়েঘরখানি প্রাণপাত পরিশ্রমে

রাজপ্রাসাদে পরিণত করিয়া যাঁহারা বাংলার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন সেই দেশপ্রাণ নিঃস্বার্থ সেবকবৃন্দের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বচক্ষে দেখিবার লোভ বিজলী কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তীর্থ-দর্শনের ন্যায় সে তাহা দেখিতে উৎসাহান্বিতা হয়। 'তীর্থ দর্শনের' পর বাঙ্গালীর গঠনমূলক শক্তির পরিচয় লাভে বিজলীর মনে হয় যে জনে জনে বাঙ্গালী যেদিন এমনি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে সেদিন "বাংলার মাটি, বাংলার জল, ধন্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান্" বলিবার যথার্থ অধিকারী সে হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

নোবেল্প্রাইজ্ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বিজলী গর্ব্ব করিয়া বলিত, "বাংলার রবিও পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে না।" হাউস্ অফ্ লর্ড্সে সত্যেন্দ্র প্রসন্নের সম্মান লাভ, প্রতীচ্য জগতে জগদীশের প্রভাব-প্রতিপত্তি, ইয়োরোপ ও মার্কিণে মাতামহের মনীষার সমাদর--বিজলীর দেশাত্মবোধ বর্দ্ধিতই করিয়া দেয়। কথায় কথায় বিজলী বলিত "সাধে কি মহামান্য গোখ্লেও বাংলার অত পক্ষপাতী হ'ন।"

বাংলার বাহিরেও বাঙ্গালীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই কলিকাতার মেয়র্ সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে অভ্যর্থনা করিতে বিজলী জামতাড়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে। সাধারণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা-অভিভাষণ পঠিত হইলে সেনগুপ্ত মহাশয় তাহার প্রত্যুত্তরে বিশেষ করিয়া বলেন, "আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই * * * এই নিশীথ রাত্রে সুখ শয্যার মায়া পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী বালিকা আমাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে এই বিদেশে এমন করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। সন্তানের গৌরবে জননীর যে কী আনন্দ, সন্তান তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না বটে! জননীর এই অযাচিত আশীর্ব্বাদের আমরা যেন উপযুক্ত হই।"

পিতৃমাতৃসন্নিধানে

"হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়,

পাছে রাণী তোলে কোলে * * *"

মায়াময়ের এ এক মধুর মায়া। "যে ধর্‌তে পারে, ধরা দিই তারে" বলিয়া ধরা পড়িলেও তাহা ছিন্ন করিয়া পলায়নের পথ নিষ্কাষণে চক্রীর সদাই প্রচেষ্টা। ছলনার তো অভাব নাই। পুত্র রূপেই হউক বা পতি রূপেই হউক, বন্ধু রূপেই হউক বা শত্রু রূপেই হউক লীলাময়ের লীলা-চাতুর্য্যে সকলেই পরিপ্লুত। মাতা যশোমতী, নায়িকা শ্রীরাধা, ব্রজসখাগণ অরাতি কংস কেহই তাঁহার স্বভাব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। হাসির লহর তুলিয়া গুটি গুটি হামা দিয়া বন্ধন ছেদনের ইঙ্গিত চঞ্চল-নয়নে তাঁহার সদাই চিত্রিত! এ খেলায় যে কী সুখ তাহা যে খেলে সেই জানে। তাই বড় দুঃখে বড় অভিমানে ভক্ত বলে "শ্যাম * * বাঁকা তোমার মন।" বিজলী গাহিত "মন, মজিল সখিরে কালার বাঁশীতে।" বাঁশরীর তানে উজান বহাইয়া অন্তরাল হইতে জগত-চাঞ্চল্য চোরের মত উপভোগ—বংশীধারীর আচরণেই বুঝি ব্যথিত জীব অবশে কাঁদিয়া বলে, "শ্যামের কথা আর বোলনা আর তুলোনা।" বড় জ্বালায় প্রিয়র নামের প্রতিও এই নির্ম্মম ঔদাসীন্য কিন্তু এ তো থাকে না। বিজলী তাই না গাহিত :—

'মনে করি ভুলে থাকি, ভুলিতে পারিনা সখি

যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই তারে দেখিতে'

কী নিদারুণ সঙ্কট! দরদী ভিন্ন সে দরদ কে বুঝিবে? আর যে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। এ বিষমের একটা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট অনুভূতি বিজলীর ছিল তাই স্নেহের স্থানে প্রীতির উপাসিকা হইয়া সে অবস্থান

করিত। সরল শিশু প্রীতিহাস্যে তাহাকে মণ্ডিত করিয়া তাহার বক্ষে নিজের স্থান স্বচ্ছন্দে করিয়া লইয়াছে। আদরিণী সঙ্গিনীদলের কাল্পনিক ব্যথা-বেদনা দূরীকরণেও প্রীতিময়ীর কি প্রাণপণ আয়াস! সহোদরদিগের চিরনির্ভরতার পরিবর্ত্তে জগদ্ধাত্রীর মত তাহার চেতনা। আর কন্যাগত-প্রাণ জনকজননীর সম্মুখে সে চিদানন্দরূপিণী নন্দিনী!

জননী কর্ত্তৃক সুচারুরূপে সজ্জিতা বিজলী যখন গাহিত:—

"আমায় কি দিয়ে সাজাবে মা
আমি হ'ব না তো গৃহবাসিনী"

তখন তাহার গান শুনিয়া লোকে 'মুখ-চাওয়া-চায়ি' করিত। পিতা উৎসুক দৃষ্টিতে কন্যার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন আর জননী তাঁহার বক্ষ-নিধিকে আদরে সোহাগে মথিত করিয়া দিতেন। বিজলীর নবম বা দশম বৎসর বয়ক্রমকালে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। বেশভূষায় তাহার একটা অনাসক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া জনক জননী ক্ষুণ্ণ হইতেন। বিজলীও ইহা লক্ষ্য করে এবং তাঁহাদের প্রীত্যর্থই সাজসজ্জার পারিপাট্যে যত্নের অবধি তাহার থাকে না। নিত্য তাহার নূতন বেশ, সজ্জা-শিল্পে নিত্য তাহার নূতন কলা। ভক্তের আকাঙ্ক্ষিতের মত জনক জননীর সম্মুখে নিত্য তাহার সেই বেশে আবির্ভাব!

বিজলীর যাহা কিছু প্রিয় সে সকলই জনক জননীর নিকট উপস্থিত না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না। সঙ্গিনীগণ ও সমাগত শিশুরদলকে পিতামাতার নিকট আনয়ন করিয়া কোলাহলে তাঁহাদের উল্লসিত না করিলে সখী-সম্মিলনের তাহার সার্থকতা হইত না। রঙ্গব্যঙ্গে সখিগণের সহিত দ্বন্দ্ব, তাহাদের নির্য্যাতন, ভ্রাতৃবর্গের পরাজয় স্বীকারোক্তি প্রভৃতি সমস্তই সে জনক জননীকে উপভোগ করাইবে।

অনুকরণে বিজলী সিদ্ধ-হস্ত। পিতামাতার নিকট সেই বিদ্যাপ্রদর্শনে

তাঁহাদিগকে হাস্যমুখর করিয়া সে আনন্দসাগরে ভাসিত। পূর্ব্ববঙ্গ ও অন্যান্য স্থানের ভাষা ছেলেমেয়েদের আঁকা-বাঁকা কথা, দাসদাসীদের 'বিশুদ্ধ' বাংলা, অপরিণত গায়কগায়িকাদিগের ভুল-ভ্রান্তি ওস্তাদী মুদ্রাদোষ, থিয়েটারের নূতন কিছু হুবহু নকল করিয়া পিতামাতার মনোরঞ্জনে তাহার অসীম উৎসাহ। আবার মাতার গলা জড়াইয়া পিতার বক্ষে লুটিয়া কন্যার কত অর্থহীন বাক্যস্রোত !

দৈনন্দিন কার্য্যাবসানে সন্ধ্যার নীরবতায় একান্তে জনকজননীকে লইয়া আনন্দরূপিনী কন্যা মধুর হইতে মধুরতর প্রকরণে তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিত। তখন সে যেন তাহার ইষ্ট-সেবায় নিযুক্তা। সুর-সাধনায় সেবিকা বিভোরা। জনকজননীর সমক্ষে সঙ্গীতে চিরদিনই বিজলী অপূর্ব্ব কলা-কুশলী। যাহারা একথা জানিত, দলে দলে তাহারা সেই গান শুনিতে সেইখানে ছুটিয়া আসিত। তাহার সে সুর-সৌন্দর্য্য অন্যত্র কোথাও যে বিকশিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

গীতান্তে জননীর আহার্য্য দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া পিতাকে লইয়া সে একত্রে আহার করিতে বসিত – উদ্দেশ্য পিতার আহারের তত্ত্বাবধান করা। মাতৃহীন পিতার মাতৃ-অভাব জনিত ব্যথা বালিকার মর্ম্মস্পর্শ করে। তাহার প্রতি কার্য্যে স্নেহ-বিগলিতা জননীর আদর-শাসন পিতা প্রাপ্ত হ'ন। বয়স্থ পুত্রকে আহার করাইতে বালিকা জননীর কত চতুরালি, পুত্র বিদ্রোহী হইলে কী মধুর ভর্ৎসনা, বশ্যতা স্বীকার করিলে কী আনন্দ !

মাতৃগৌরবে কন্যার হৃদয় সদাই পূর্ণ। নীরবে সে তাহা উপভোগ করিত। জননীর সেবার ভার অপর কাহারও হস্তে দিবার কল্পনা করিতেও কখনো সে পারে নাই।

শয্যাগ্রহণ করিয়াও বিজলীর হাসি-গল্পের শেষ হইত না। জনকজননী উভয়কেই তাহাতে যোগদান করিতে হইত। তাহার চেতনাবস্থার প্রতি

মুহূর্ত্ত তাঁহাদের সেবা ও পরিচর্য্যায় এই ভাবেই নিয়োজিত হইয়াছে। নিদ্রাগতা বিজলী সময়ে সময়ে 'ধড়ফড়' করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিত। জননী ঘুমাইয়া থাকিলে নিশ্চিন্তমনে আবার সে নিদ্রার আয়োজন করিত। নিদ্রাভঙ্গে কিন্তু যদি সে দেখিত জননী তখনও নিদ্রা যা'ন নাই তাঁহার গলা জড়াইয়া স্নেহময়ীর কী অভিমানের ঘটা, "অসুখ করবে যে—জানিনি বাবু।" জননী বলিতেন "কী ক'রে টনক্ তোর ন'ড়ে, আমিও জানিনি বাবু, আয় ঘুমো।" স্নেহের দ্বন্দ্ব সেইখানেই শেষ হইত। টনক-নড়ার কারণ কিন্তু নির্দ্ধারিত হইত না।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া জনকজননীর বন্দনা বিজলী করিত তাঁহাদের বক্ষে লুটাইয়া। সে যে তাহার স্বর্গাধিক প্রিয়! শয্যাত্যাগ-কালে দুর্গানাম স্মরণে ভুল সময়ে সময়ে তাহার হইত সেই প্রিয়বাসের চিরসৌন্দর্য্যের আকর্ষণে। নিমেষের ব্যবধানও তখন তাহার সহিত না। সেই বিজলীই আবার গাহিত, "পথের কথা ব'লে দেবে কে আমাকে।" কী করুণ সে সুর! অজানা পথের সন্ধানে কী ব্যাকুলতা! 'বিপথের' ভয়ে কী শিহরণ! গান শেষে গায়িকা মায়ের কোল ঘেঁসিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া থাকিত। সমস্যার পূরণ তাহার যেন সেই খানেই হইয়া গিয়াছে।

অভিজ্ঞানে

কৈশোরে বিজলী উপনীতা হইলেও শৈশবের তাহার সেই সরলতা ও প্রফুল্লতার কোনো বিকার ঘটে নাই। বাদ্যভাণ্ড সহিত শোভাযাত্রা করিয়া রাজপথ দিয়া 'বর' যখন যাইত, নৃত্যশীলা-মুক্ত-বিহঙ্গিনীর মত স্বচ্ছন্দগতিতে পিতার নিকট যাইয়া সে বলিত "বাবা বর দে'খবে এসো।"

জামতাড়ায় নিত্যই 'বিয়াঘর'—পথে ঘাটে 'বরকণের' ছড়াছড়ি। ঢাক, ঢোল বাজাইয়া পাল্কী চড়িয়া বাটীর নিকট দিয়া 'বর' যাইলে ঝড়ের মত ছুটিয়া গিয়া বিজলী বর দেখিয়া আসিত। দেখিয়া আসিয়া কী হাসি। বরের আকৃতি, পরিচ্ছদ, বসিবার ঢং, বরযাত্রীদের কোলাহল তোতাপাখীর মত আওড়াইয়া সকলকে তাহা শুনাইতে সে বসিয়া যাইত। কোনো কোনো সময়ে সে বলিত,"এ তবু ভাল কোলকাতায়—সে যেন জেলেপাড়ার সং।" নবপরিণীতা কোনো সঙ্গিনী তাহার পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহাকে পিতার নিকট আনয়ন করিয়া হাস্যচটুলতার সহিত বিজলী বলিয়াছে 'বিয়াঘর থেকে এলো আজ।' তারপর তাহাকে লইয়া পূর্ব্বের সেই হাসি, খেলা, গান।

বিজলীর নয় বৎসরের বয়সে গৌরীদানের সুযোগ, তাহার পিতা প্রাপ্ত হ'ন। লক্ষীর কোন বরপুত্র তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্য বিজলীকে প্রার্থনা করেন। গৌরীদানের পূণ্য ভাগ্যে না থাকায়, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলেই কন্যার পিতাকে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য করেন। সে যাহা হউক সেই সূত্রে পাত্রপক্ষীয়দের আগ্রহাতিশয্যে "মেয়ে দেখানর" অনুরোধ তাঁহাকে রক্ষা করিতে হয়। গৌরীতুল্যা বেশভূষায় সজ্জিতা বিজলী হাসি হাসি মুখে সভাস্থলে আসিয়া যখন দেখা দেয়, তখন সভাস্থ সকলের বিস্ময়-পুলকের আর সীমা থাকে না। এ যে ধ্যানের মূর্ত্তি তাঁহাদের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত। সকলের সম্মুখেই বরকর্ত্তা বলেন, এমন কী পুণ্য করেছি যে ইনি আমার বংশের কুললক্ষ্মী হ'বেন। সে কথা শুনিয়া বিজলী কি বুঝে কে জানে কিন্তু বড় মধুর হাসি হাসিয়া তাহাকে সে স্থান হইতে লইয়া যাইতে পিতাকে ইঙ্গিত করে। এই ঘটনার এই খানেই শেষ হয়। পরে বিজলীর কথাবার্ত্তায় কাহারও মনে হয় না যে 'মেয়ে দেখান'র জন্য একটা ক্ষীণরেখাও

তাহার প্রাণে অঙ্কিত হয়! 'পাঁচ জনের' কাছে সাজিয়া গুজিয়া যেমন সে দাঁড়াইত বসিত, এ ব্যাপারটাও তাহারই মধ্যে একটা সে ধরিয়া লয়।

কন্যার প্রাণে কোনো রেখা অঙ্কিত না হইলেও, অপ্রত্যাশিতভাবে এই কন্যা যাত্রা পিতার প্রাণে একটা গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। বিজলীকে একদিন যে দান করিতে হইবে, ইহা এতদিন তিনি জানিয়াও জানিতে চাহেন নাই। কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত প্রাণে কালহরণ তিনি করিতে থাকেন। একটী তরঙ্গের মৃদু আঘাতেই কঠোর বাস্তবের সম্মুখে উপনীত হইলে ভয়ে ত্রাসে অধিকতর স্নেহের কঠিনতর ডোরে কন্যাকে আবদ্ধা করিয়া রাখিতে তিনি প্রয়াসী হ'ন। হায়রে স্নেহান্ধ! বিজলীর মাতামহী সেই 'সম্বন্ধের' উল্লেখ করিয়া জামাতাকে একদিন বলেন, "ভাল কর্‌লে না সুশীল।" বিজলী সেইখানেই ছিল। সে পিতার মুখেরদিকে চাহিয়া বলে, "পিঠ্‌টা সুড়্‌সুড়্ কর্‌ছে একটু চুল্‌কে দাও না বাবা।" তাহাতে রঙ্গ করিয়া মাতামহী বলেন, "ওরে পিঠ্ চুল্‌কে দেবার ভাল লোকের যোগাড় করে দিতেই তো বাবাকে বলছিলুম—শুন্‌ছে কৈ?" দৌহিত্রীও ত্বরিৎ উত্তর দেয় "তুমি জাননা দিদামণি বাবার মত কেউ পারে না,—যাও না।" ইহাতে হাসির স্রোত একটা সেস্থানে বহিয়া যায়। বিজলী তাহা উপভোগ করিতে পারে নাই। সে পিতার কাছ ঘেঁসিয়া শুইয়া পড়ে।

ইহার পরে পিতার বিশিষ্ট বন্ধু, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র বিজলীকে দেখিয়া, বিজলীর গল্প ও গান শুনিয়া কন্যাধিক সমাদর তাহাকে করেন। বাটী ফিরিবার সময়ে একান্তে বন্ধুকে লইয়া যাইয়া তিনি বলেন, "একটা মতলবে আজ এসেছিলুম, মেয়ে তোমার তা ফাঁসিয়ে দিলে। দেখ ভায়া অনেক মেয়ে এ বয়সে দেখলুম্ কিন্তু এত সরল এত উদার—এ একেবারে খাঁটি সোনা, যার তার গলায় মানাবে না।"

একটু থামিয়া তিনি আবার বলেন, "মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছ নাকি ? একটা কথা শুনবে ভায়া হিঁদুর চোখে বড় হ'লেও মেয়ে তোমার এখনও যথার্থ ই নিতান্ত শিশু - অকালে তার শিশুত্ব কেড়ে নিও না ।"

এই প্রশংসাবাদে পিতা আহ্লাদিত না হইয়া বিমর্ষই হ'ন—এ রত্ন কাহাকে দান করিতে হইবে কে জানে ! পিতার বিমর্ষতায় অভিমানের সুরে কন্যা বলে, "তোমাদের নিয়ে পারিনি বাবু, কখন যে তোমাদের কী হয় ।" সেই দিন সন্ধ্যা-সমাগমে বিজলী গান গায়, "বাবা পাগলা ভোলা মা এতই কী ভারি ।" 'শিশু বিজলীর' পরিচয় এ বটে ! দিনের ঘটনা মনে পড়ায় তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন । তন্ময় হইয়া সে তখন গাহিতেছিল : -

আনিগে জবা তুলে, মাকে সাজাব ব'লে
বাবাকে পূজিব দুটো বিল্বদলে—
হর বোম্ বোম্, হর বোম্ বোম্
—বামে শোভে গৌরী—"

গান শেষ হইলে সে জিজ্ঞাসা করে, "হ্যা বাবা, দাদামণি বিয়ে কর'তে এসে দিশে হারিয়ে সারারাত্ পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন না ? আর ছাঁদনাতলায় কোমরের কসি খ'সে গিয়ে পরণের কাপড় খানাও প'ড়ে গিয়েছিল তো ? তা লোকে কি বল্লে ?

"আমি কি সেখানে ছিলুম নাকি রে, আমি কি ক'রে জানবো ?"

কন্যা হাসিয়া বলে— নিশ্চয়ই সবাই ঠিক করেছিল, পাগল, মাথা খারাপ । ভাগ্যিস্ ঠাকুরমার মা ছিল না, তা হলে জামায়ের কাণ্ড দেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিত ।

পিতা তুমি হলে কি করতে ? কন্যা—তা কি করে ব'লব—

এ কথা বলিতে না পারিলেও কোনো পরিচিত গৃহে বিবাহোপলক্ষে

বর এবং বরপক্ষীয়দের 'পণ' লইয়া ঘোর বাকবিতণ্ডা ও কল্পনাতীত অভদ্র ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া বিজলী নিজের মতামত প্রকাশ করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করে নাই। সেই প্রিয়ভাষিণী বালিকার মুখ হইতে অপ্রিয় কঠোর বাক্যই উচ্চারিত হয়। নারীর অমর্য্যাদায় রোষে ক্ষোভে সংযমের বাঁধ তাহার ভাঙ্গিয়া পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি-প্রাপ্ত একজন "কলা-প্রভু" (M.A.) কোনা ভদ্র-কন্যার পাণিগ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সামান্য অর্থের লোভে "রাতারাতি" কেমন করিয়া অন্যত্র বিবাহ করিয়া নিজের বংশ ও বিদ্যার পরিচয় প্রদান করে সে কথা শুনিয়া বিজলী বলে, "ছোক্‌রার স্কলারসিপ্‌ ডবল্‌ ক'রে দেওয়া উচিত, কী বিদ্যে! মেয়েটার কিন্তু বরাত জোর, জোচ্চোরের হাত থেকে বেঁচে গেল!"

মাতামহীর মৃত্যু ও মধ্যমাগ্রজের সাংঘাতিক পীড়ার অনেকদিন পরে পর্য্যন্ত বিজলীর বিবাহের কোনো কথাবার্ত্তাই হয় নাই। চিরন্তন "কলাগাছের বাড়্‌" কিন্তু তাহাতেও বন্ধ থাকে না। কিশোরীর অঙ্গে যৌবনেব সুষমা ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। শিশুর সরলতায় জননীর কোমলতায় বিজলীর সে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

বৈচিত্র্যে

সহোদর সম্বন্ধে জ্যোতিষীর গণনায় দৃষ্ট "দৃষ্টি-দোষ" নিজ কর্ম্ম-ফলে বিজলী বার বার কি ভাবে খণ্ডন করিয়া দেয় তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইতে না হইতেই আর এক জ্যোতিষী বিজলীর কোষ্ঠী দেখিয়া বলেন যে জাতকের বৈধব্য-যোগ আছে। সেই সুলক্ষণা কন্যার বৈধব্য-যোগ! গণনায় আস্থা না থাকিলেও ইহাতে শঙ্কিত না হইয়া কেহ থাকিতে পারে না—বিজলীর পিতামাতাও যথেষ্ট শঙ্কিত হ'ন। তবে অভ্রান্ত নহে কেহই। বিপরীত সিদ্ধান্তে যে জ্যোতিষী উপনীত হ'ন নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে। ইহা ভাবিয়া এবং একাগ্র তপস্যায় দৈবকেও বিমুখ করিয়া দিবার শক্তির পরিচয়দান বিজলী তাহার জীবনে পূর্ব্বে করায় জনকজননী কথঞ্চিত আশ্বস্ত হ'ন।

এ সকল বৃত্তান্ত না জানিলেও ঠিকুজী 'নাড়াচাড়া' করা বিজলী দেখিতে পাইয়াছিল। জ্যোতিষী চলিয়া যাইবার পরে জননীকে সহাস্যে সে বলে, "কেমন, একটা ঘা দিয়ে গেল ত?" জননী অসহিষ্ণু হইয়া বলেন, "থাম্ তোর্ আর পাকামি কর্‌তে হবে না—মেয়ে আছেন এত খোঁজেও।"

কন্যা—বেশ, থাক্‌বো না। দেখ মা, সেই বোস্ পুরোনো ভীমপলশ্রী খানা দোরস্ত ক'রে নিয়েছি। কথাগুলো তো মন্দ নয়—'চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি?' জননী—রাত্রে শোনাস্। বিজলী কিন্তু বলিতে চায় যে চিন্তাময়ী তারা তাহার চিন্তাও করেন।

মহাপূজার আর অধিক বিলম্ব নাই। তার যত ফরমাইস্ দেওয়া থাকিলেও কি একটা মনে পড়ায় বিজলী জননীর সহিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া পিতার নিকটে গিয়া বলে, "পূজোর সময় কোল্‌কাতায় থাকা হবে না বলে ফাঁকি যে দেবে, তা হচ্ছে না—ব'লে রাখছি।" সে কথায় পিতা হাস্য করিলে ঈষৎউষ্মাভরে কন্যা বলে, "না থাক্—ব'য়ে গেল।" পর-ক্ষণেই আবার সোহাগের সুর—"চার্ দিনে ত চার্ রকমের চাই বাবা।"

সেই বৎসর পূজার সময়ে জামতাড়ায় থাকা হয়। বাল্যাবস্থায় কলিকাতার পথ ঘুরিয়া বিজলী যেমন ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইত; জামতাড়াতেও সে তাহাই করিয়াছিল। সখিবেষ্টিতা সুসজ্জিতা বিজলী আনন্দময়ীর আগমনে সে দেশ আনন্দমুখরিত করিয়া দেয়।

বিজলীর সাজসজ্জা পূজার কয়দিন জনকজননীর আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য, আর সেই কারণেই তাহার 'চার্ দিনের চার্ রকমের' বাহানা। নিরঞ্জনের পর স্থানীয় বহু ব্যক্তি বিজয়াসম্ভাষণার্থ যখন জামতাড়ার বাটীতে আগমন করেন বিজলী তখন গাহিতেছিল :—

"প্রেম পূজা আজি সাঙ্গ করেছি—
প্রতিমা ফেলেছি ভাঙ্গিয়া—"

রক্তবস্ত্র পরিহিতা বালিকার কণ্ঠ নিঃসৃত কী সে করুণ রাগিণী—বিসর্জ্জন না চির-আমন্ত্রণ!

গান শেষ হইলেও সেই সুরের আবেশ হইতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মুক্তি পা'ন্ নাই। গীতান্তে গায়িকা যখন অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হয় তখন তাঁহারা তাহাকে আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদে প্রত্যভিবাদন করেন। সে দিনের উৎসব তাঁহাদের বিজয়োৎসবই হইয়াছিল।

জামতাড়ায় সূপকার ছিল একজন উড়িয়া। একদিন সে রন্ধন করিতে করিতে হাত পুড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। বিজলী তাহা শুনিবামাত্র রুদ্ধশ্বাসে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সময়োচিত সেবাদ্বারা তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলে। তৎপরে সে তাহার পিতাকে বলে, "মনেআছে বাবা পাঁচ বছর বয়সে খেলাঘরের রান্না রাঁধ্‌তে গিয়ে কি রকম অগ্নিকাণ্ড করে বসি। ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে।"

পিতা।—আছে বৈ কি। আচ্ছা বল্ দেখি আগুণ নেভাবার পরেও তোর্ অত কান্না কেন পেয়েছিল?

কন্যা।—তুমি নিজের বুকে চেপেধ'রে তো আগুন নেভাও। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন চার্‌দিকে তখনও আগুন—সেই জন্যে।

জামতাড়াতেও বিয়ের পদ্যের অভাব হয় নাই, একদিন সেইরূপ এক প্রস্থ পদ্য হাতে করিয়া বিজলী আসিয়া উপস্থিত। জননী জিজ্ঞাসা করেন "কিও"? কন্যা হাসিয়া বলে, "অগ্নিপরীক্ষা"—তবে সীতার নয় পারুলের। এর পরে 'পাতালপ্রবেশ।' এটা রেখে'দি কোল্‌কাতায় গিয়ে বাবাকে দো'বো ক'নে জ্যাঠাকে (মুনীন্দ্রপ্রসাদ) পাঠিয়ে দিতে।

জামতাড়া হইতে প্রত্যাগমনের কিছুকালপরে বিজলীর 'সম্বন্ধ' লইয়া ঘটক ঘটকীর যাতায়াত আরম্ভ হয়। একজনকে একদিন বিদায় দিয়া গৃহস্বামী দ্বিতলে গমন করিলে গৃহিনী জিজ্ঞাসা করেন, "কে ও ক'দিন ঘুর্‌ছে" গৃহস্বামী গম্ভীরভাবে বলেন, "অগ্নিপরীক্ষার-অগ্রদূত।" বিজলী জননীর নিকটেই ছিল। পিতার কথায় মৃদু হাস্য করিয়া সে স্থান ত্যাগ করে। বিজলীর তৃতীয় জ্যেষ্ঠ তাতের (৺কৃষ্ণপ্রসাদ) পুত্র প্রভাতচন্দ্র তাহার কর্ম্মস্থল সিলোন্ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কনিষ্ঠ খুল্লতাতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। খুল্লতাতপত্নী বধূমাতার সংবাদাদি লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৌমা সিলোনে যাবে না?" প্রভাত বলে "এবার না। বিজলীর বিয়ে দে'বে শুনছি, তা হ'য়ে যদি যায় লুচিটায় সে বাদ্ প'ড়বে না" খুল্লতাতপত্নী সে কথার কোনো উত্তর দে'ন নাই। প্রভাত চলিয়া যাইলে বিজলী বলে, "সিলোন্‌টাকেই লঙ্কা ধরে নেওয়া যাক্—যখন লঙ্কা তখন অশোককানন, চেড়ী সবই থা'কবে। তবে বাঙ্গালীর মেয়ে ত্রৈলঙ্গী নয় এই যা ভরসা"। পিতা জিজ্ঞাসা করেন "আবল্ তাবল সব কি বক্‌ছিস্?" বিজলী হাসিয়া বলে, "বকায় কেন?"

মালতী একদিন কোথা হইতে কি শুনিয়া আসিয়া আগ্রহভরে বিজলীর পিতাকে জিজ্ঞাসা করে "বাবা বিজলী দিদির বিয়ে হ'বে, আমার হ'বে না?" মালতীর প্রশ্নে বিজলী প্রাণ ভরিয়া হাসিতে থাকে। মালতীও তাহাতে যোগ দান করে। মালতীকে বিজলীর পিতা বলেন "হবে বৈকি—তা তোমার বিয়ে আগে হোক্ না?" মালতী তাহাতে সম্মত হয় না বলে, "না এক সঙ্গে হবে।" অস্ফুট স্বরে বিজলী মালতীকে বলে, "বিয়ে হ'লে তারা যে তোমায় আমার কাছে আস্‌তে দেবেনা।" বিজলীর কাছে সরিয়া যাইয়া মালতী বলে, 'ঈস্ তাহ'লে বিয়ে ফিরিয়ে দোব।' ইহার পরে বিজলী তাহাকে কি মন্ত্র দেয় কে জানে কিন্তু বিবাহের কথায় সে বলিত "বিয়ে ভাল নয়।"

কলিকাতা সিঁদুরিয়াপটীর সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক বংশজ শ্রীযুক্ত ললিত মাধব মল্লিক বিজলীর পিতাকে প্রতিবেশীরূপে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হ'ন। অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য দুইজনের মধ্যে অচিরে স্থাপিত হয়। বিজলীর প্রতিও তাঁহার স্নেহের সীমা ছিল না। সেই স্নেহের আকর্ষণে ঘোর অসুস্থতা নিবন্ধন অপটু দেহ খানি তাঁহার কোন মতে চালাইয়া বিজলীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি ছুটিয়া আসিতেন। চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও সে ছুটাছুটি বন্ধ হয় নাই। তিনি বলিতেন, "কবে মা লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন, দিন থাক্‌তে পূজো সেরে রাখি"। বিজলীর সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে মালতীর বিবাহ-বাসনা পরিত্যাগের গল্প শুনিয়া মল্লিক মহাশয় গদগদকণ্ঠে বিজলীকে বলেন, "এম্‌নি ক'রে সবাইকে মজিয়ে কোথাও চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পার্‌বি মা?" বিজলী করুণার্দ্র হাস্যে সে প্রশ্নের উত্তর দান করে।

বিবাহপ্রসঙ্গে

বিবাহ যোগ্যা কন্যা ঘরে থাকিলে যেমন হয়—'রবাহুতের' দল 'পাঁজি পুঁথি' কুক্ষিগত করিয়া একে একে দুয়ে দুয়ে বিজলীর পিতৃগৃহে দেখা দিয়া বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মূর্খ ধনবান পাত্র, নির্ধন বিদ্বান পাত্র, বুনিয়াদি ঘরের অদ্ভুৎ জীব—কুক্ষিগত 'পুঁথি' হইতে বাহির করিয়া তাহাদের 'কুলুচি' কাটিয়া বায়স্কোপের ছবির মত সকলকে দেখাইতে রবাহুতদলের যেমন উৎসাহ—তাহা দেখিতে দর্শক দিগেরও তেম্‌নি আগ্রহ।

এই চাঞ্চল্যের আবর্ত্তে পড়িয়া গৃহস্বামী ও গৃহিনীর অসচ্ছন্দতার সীমা থাকে নাই। যাহার জন্য এই সব সে সকলের কিছুতেই তাহার আগ্রহের কোনো নিদর্শন পাওয়া তো দূরের কথা কেহ সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিলে সহাস্যে স্থান ত্যাগ করতঃ বক্তার উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ নিমেষে সে রোধ করিয়া দিত। শত লোকের শত সহস্র কথায় একদিনের জন্যও বিচলিতা বিজলী হয় নাই। জনকজননীর সেবা ও আরাধনা সহোদর-বর্গের সুখ-সৌভাগ্য কামনা, সঙ্গিনীগণের আদর-অভ্যর্থনা ও দরিদ্র-নারায়ণের পূজায় কাল যথাপূর্ব্ব সে কাটাইয়া দিত।

বিবাহপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেও কন্যার সেই অনুৎসাহ ভাব ও তাহার কোষ্টীর বিচার-কথা আলোচনা করিয়া জনকজননী বিজলীর বিবাহদানে কালক্ষেপ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন—করেন ও তাহাই। তাহার ফলে আত্মীয় ও পরিচিত অনাত্মীয়েরা যথেষ্ট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। তাহাতেও ঔদাসীন্য অবলম্বন ভিন্ন জনকজননীর গত্যন্তর ছিল না। বাটীর মধ্যে বিবাহের কথা তুলিয়া কেহ যদি কখনো জনকজননীকে উত্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইত দশ প্রহরণার ন্যায় সহাস্য-বদনে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কথার স্রোত সঙ্গে সঙ্গেই বিজলী ফিরাইয়া দিয়াছে। সুর তখন ভিন্ন—এমন মেয়ের বিয়ের আবার ভাবনা! তাহা শুনিয়া বিজলী হাসিত।

এই সময়ে গৃহস্বামী বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ভগ্ন দেহে চিন্তা-বিষের অবাধ-প্রবেশাধিকার চিরন্তন। কন্যার বিবাহের ভাবনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া দেয়। বিজলী তাহা লক্ষ্য করে। পরের মস্তকে 'কাঁঠাল ভাঙ্গেন' যাঁহারা চিরকালই, অপটু দেহ চিন্তা-ক্লিষ্ট পিতার সাময়িক চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে তাঁহারা কালবিলম্ব করেন নাই। সমাজ, ধর্ম্ম, রীতি, নীতি প্রভৃতির নানা কথা "আওড়াইয়া" কন্যার বিবাহ-দানের আশু-ব্যবস্থা করিবার হিতোপদেশ দানে ব্যাকুল পিতাকে আরও ব্যাকুল তাঁহারা করিয়া দেন। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট 'হিসাব নিকাশ' তাঁহার, গোলমাল হইয়া যায়। গৃহিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হয়, "বিয়ের যোগাড় দেখা যাক্।" এ সিদ্ধান্তের মূল—স্নেহ কর্ত্তব্য না স্বার্থপরতা?

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পরে পিতার চিত্ত-প্রফুল্লতা কন্যার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি যখন তাহার জননীকে উপলক্ষ করিয়া তাহারই সম্মুখে তাহার বিবাহ-দানের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, "বিজলী কি বলে"—নত মস্তকে একটা ক্ষীণ হাসির ক্ষীণতর রেখা নয়ন কোনে ফুটাইয়া সে তাঁহাদিগেরই সন্নিকটে বসিয়া থাকে। তাহাতে তাহার জননী বলেন, "ও কি ব'লবার মেয়ে!" জননীর মুখ পানে চাহিয়া কন্যার আবার সেই হাসি!

কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিজলীর জনকজননী দেখেন যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তকমাধারী গণ্ডমূর্খ, সৌম্য-মূর্ত্তি মিষ্টভাষী ক্রূর, বক্তৃতাবাগীশ পণ-বিরোধী ভণ্ড—সৃষ্টির কলঙ্ক—মানব জন্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কার সাধনের আবরণে লুণ্ঠন ও হত্যার অভিযানে সঙ্ঘবদ্ধ। ইহা দেখিয়া রোষে ক্ষোভে পিতা বিচলিত হ'ন, নিষ্ফল আস্ফালনে জননী অভিসম্পাত করেন। তাহাতে হিতৈষীরা বলেন, "বাজার এই, চট্‌লে চল্‌বে কেন?" যাহার যাহা মনে আসিত সে তাহাই বলিত। বিজলীকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কিন্তু কেহ বিমনা দেখে নাই। সন্তানের মঙ্গল কামনায় তদ্গতচিত্ত জননীর ন্যায়ই সে বিচরণ করিত। সংসারের ভ্রূকুটী তাহাকে বিচলিত করে সাধ্য কি! এই সময়ের একদিনেরকথা। শিব-পূজা করিয়া বিজলী প্রণাম করিতেছিল:

> নমঃ শিবায় শান্তায় কারনত্রয়হেতবে,
> নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর।

নিজেকে নিবেদন করিয়া আবার বলে:

> ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং
> স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব
> ঈশ ত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং
> নমোঽস্তু ভূয়োঽপিনমো নমস্তে।

সে তো ক্ষুদ্র নহে সেও যে বিরাট! পুলকানন্দে পূজারিণী সমাধিস্থা। সমাধিভঙ্গে সে স্থানে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বিজলী উপলব্ধি করে—ফিরিয়া দেখে এক আত্মীয়া। সহাস্য সমাদরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সে করিলে তিনিও সহাস্যে বলেন, "পূজো হ'ল।" সেই সময়েই পিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া বিজলী বলে, "বাবা ডাক্‌ছে চ'ল ওপরে যাই!"

আত্মীয়াটী বিজলীর জননীকে পরে বলেন, "শিব্ পূজোর মন্তর্ মেয়ে সব গোল্ ক'রে ফেলেছে, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিও।" সে কথা বিজলীকে বলা হইলে হাসিয়া সে ব'লে, "যে ভুলো ঠাকুর, সব ভুলিয়ে দেয়।"

পূজায় ভুল ও ঠাকুরের ভুলে কিনা কে জানে বিজলীর 'বিয়ের ফুল' ফুটিতে বিলম্বই ঘটে। ত্রস্ত্য ভীত পিতা সাবধানতার সহিতই অগ্রসর হ'ন। "সম্বন্ধ" মনোনীত তাঁহার আর হয় না— ভাবনারও আর শেষ নাই।

সান্ধ্যসম্মিলনে সুমধুর সঙ্গীতধারায় জনকজনীর প্রাণ স্নিগ্ধ করিয়া দিবার বিপুল আয়াসে বিজলী কত নূতন গান গাহিত কত নূতন খেলার রঙ্গ করিত। পিতা একদিন বলেন, "তোমায় সেই ভাবনার গানটা গাও-তো।' বিজলী গায়ঃ—

"তোর আপনজনে ছা'ড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চ'লবে না
তোর আশালতা প'ড়বে ছিঁড়ে
হয়তো রে ফল ফ'লবে না—"

গায়িতে গায়িতে নির্লিপ্তা উদাসিনীর ন্যায় গায়িকা বিভোরা!

পাত্রনির্ব্বাচনে

পাঁতি পাঁতি করিয়া পাত্রের অন্বেষণ করিতে বিজলীর জনক জননী বাকি কিছুই রাখেন নাই। সন্ধানও মিলে অসংখ্য। 'দৌলত' 'বালাখানা,' 'গাড়ীজুড়ি,' 'এম্, এ, ল' এর সংখ্যার অপ্রতুল হয় নাই। অপ্রতুল হয় কন্যার শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গৃহলক্ষ্মীস্বরূপ তাহাকে বরণ করিয়া তুলিয়া লইবার "ঘর-বরের।" পাত্র নির্ব্বাচন করা সুতরাং জনকজননীর পক্ষে সমস্যার বিষয়ই হইয়া দাঁড়ায়।

"অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যার" উদ্দেশে বহির্গত অবিমৃষ্যকারীর দল ফেরুপালের ন্যায়ই বিতাড়িত বর্ত্তমানক্ষেত্রে হয়। প্রত্যাখ্যাত সেই সকল ব্যক্তির অসচ্ছন্দতায় বিজলীও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না। জনকজননী তাহার তাহাকে পণ দিয়া বিলাইয়া দিতে যে আদৌ প্রস্তুত নহে, ইহা জানিতে পারিয়া তাহার আনন্দের সীমা থাকে নাই।

"ধনুকভাঙ্গা পণে" আত্মীয় ও অন্তরঙ্গেরা বিজলীর জনকজননীর প্রতি অসন্তুষ্ট না হইলেও বারবার বলিয়াছেন যে পণপ্রথাযুগে কাল-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে কন্যার বিবাহদানে বেগ পাইতে হইবে যথেষ্টই। কন্যাগত-প্রাণ জনকজননী তাহাতেও শঙ্কিত বা সঙ্কল্পচ্যুত হ'ন নাই। বিজলীর জন্য যিনি বিজলীকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত তাঁহারই প্রস্তাব সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

অপেক্ষা অধিক দিনের জন্য তাঁহাদিগকে করিতে হয় নাই। কলিকাতা নিবাসী ৺ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্রের এক পৌত্রের বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পাত্রপক্ষ সাগ্রহে বিজলীকে প্রার্থনা করেন। পাত্রের পিতা সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। পাত্র সুশিক্ষিত, সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ও চরিত্রবান। পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, সুতরাং পাত্রপক্ষ পাত্রের কুলকর্ম্ম করিতে সমুৎসুক।

এই মিত্রবংশ কন্যার পিতৃবংশের সহিত বহুকাল হইতে পরিচিত থাকায় এবং কুলধর্ম্ম রক্ষার্থে তাঁহাদের সবিশেষ আগ্রহ দর্শনে কন্যাপক্ষীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা এ 'সম্বন্ধ' বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করেন। দেনা পাওনার' কোনো কথার উল্লেখ পাত্রপক্ষ না করায় কন্যার পিতাও সম্বন্ধটী প্রীতির চক্ষে দেখেন। পূর্ব্ব হইতেই উভয় বংশের মধ্যে বিবাহসূত্রে আত্মীয়-কুটুম্বের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত থাকায় উভয় পক্ষই নূতন করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিজলীকে দেখিয়া বিজলীর কথা শুনিয়া তাহাকে কুললক্ষ্মী করিবার আগ্রহ পাত্রপক্ষের শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। সেই পাত্রেই বিজলীকে দান করিতে পিতা প্রতিশ্রুত হন। তখন শ্রাবণের শেষাশেষি। স্থির হয় পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

পাত্রপক্ষকে প্রতিশ্রুতি দানের পূর্ব্বে প্রস্তাবিত 'সম্বন্ধ' সম্বন্ধে কন্যার মনোভাব নিরূপণার্থ নিকট আত্মীয়াদের পিতা নিযুক্ত করেন। তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। মৌনভাব অবলম্বনে তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিজলী ব্যর্থ করিয়া দেয়। জননীকে স্বয়ং সুতরাং সে ভার গ্রহণ করিতে হয়। মাতা ও কন্যার মধ্যে কথাবার্ত্তা যাহা হয় তাহা সমস্তই স্বামীকে জানাইয়া গৃহিনী বলেন, "মেয়ে বোধ হয় কুষ্ঠী গোনা-গাথার কথা কিছু শুনেছে।" চমকিত হইয়া স্বামী বলেন, "তার মানে ?" গৃহিনী বলেন, "মানে আর কিছুনয় বিজলী ব'লছিল যে ঠাকুরমা তো ড্যাং ড্যাং করে গেছেন জানি,

"অন্ত অনেকের কথা, বড় বড় চোখ্ বা'র ক'রে পিসিমা কি সব্ বলেন না?" স্বামী—তার পর? গৃহিনী—তারপর আমি আর কিছু বলিনি, ঠিকুজি খানা আর একবার না দেখিয়ে ঠিক্ ঠাক্ কিছু কোরো না। গৃহিনীর কথায় ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া গৃহস্বামী বলেন, "ঠিকুজী দেখাতে হয় দেখাও। একটা কথা কিন্তু তোমাকেও এতদিন বলিনি। শোনো—অন্য কারো কথায় নেচে মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ আমার হয়নি! নাচিয়েছেন আমার মা। আচম্বিতে এক দিন এসে তিনি বলেন, মেয়ের বিয়ে দিবিনি। সেই থেকেই বিজলীর বিয়ে দেবার চেষ্টায় ঘুরছি। সম্বন্ধও এসে উপস্থিত হয়েছে মনে হয় ভালই—বল এখন কি কোর্ব্ব।" সেই সময়ে বিজলী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। পিতা সস্নেহে তাহাকে বলেন, "হ্যাঁ মা আমাদের ছেড়ে থাক্‌তে পারবিনি?" প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কন্যা নীরবেই থাকে। পিতা, আবার বলেন, "চুপ্ ক'রে থাক্‌লে চ'লবে না মা—ব'লতে হবে ঠিক্ ক'রে এগুবো না পেছুবো।" বিজলীর নীরবতা তাহাতেও ভঙ্গ হয় নাই। পিতা তাহাতে উৎকন্ঠিত হইয়া পড়েন। মৃদুকণ্ঠে বিজলী তখন বলে, "বলবার আমার কি আছে।"

পিতৃদত্ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উপহারও সানন্দচিত্তে গ্রহণ বিজলী চিরদিনই করিয়াছে। বস্ত্র পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ক্রয় কালে সে সকল নির্ব্বাচনের ভার প্রদান সে করিত তাঁহারই উপর। স্বামী নির্ব্বাচনের ভারও নির্ব্বিকার চিত্তে পিতার উপর সে অর্পন করে।

উদ্যোগপর্ব্ব

বিবাহের কথা 'পাকা' হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমারোহ করিয়া 'বিজলীকে 'পর' করিয়া দিবার আয়োজন করিতে সকলে যখন মত্ত বিজলীর এতটুকু উত্তেজনা তখনো কেহ দেখিতে পায় নাই। আপনার কাজ লইয়াই সে আপন্ মনে থাকিত। গৃহকর্ম্ম, পূজা-পাঠ, অধ্যয়ন, হাসি-গল্প গানের ব্যতিক্রম একদিনের জন্যও তাহার ঘটে নাই। চিরাভ্যস্ত তাঁহার এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ঝড়ের মত আসিয়া বিজলীর ভাবী শ্বশুর একদিন দেখা দেন। আনন্দ-মেলার কোথাও কিছুমাত্র বিপ্লব

আনন্দময়ী তাহাতে ঘটিতে দেয় নাই। ঝটিকার বেগ মুহূর্ত্তে শমিত হইয়া মৃদু বায়ুহিল্লোলে জনগণের প্রাণ শীতল হয়। "যাদুকরী" এক দণ্ডে তাঁহাকে এমন যাদু করে যে দিনের পর দিন তাহার কাছে তাঁহাকে আসিতেই হইত।

বিবাহোপলক্ষে ভাবী পুত্রবধূর জন্য বস্ত্রালঙ্কার ক্রয় করিবার পূর্ব্বে মিত্রমহাশয় বিজলীর পরামর্শ গ্রহণে সচঞ্চল হইলে লোকে 'ব'য়ের আদর' দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছে। সে সমাদরের প্রত্যাখ্যান বিজলী করে নাই, কিন্তু কন্যার সমাদরে আনন্দ-বিভোর জনকজননীর মুখপানে চাহিয়া একটা অজানা ভাবনায় প্রাণ যেন তাহার আলোড়িত হইত। সে তখন নীরবে তাঁহাদের কাছে বসিয়া থাকিত।

সবস্ত্রা সালঙ্কারা কন্যাদান করিবার জন্য বিজলীর জনকজননী যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং সে সকলের সম্বন্ধে কন্যার 'পছন্দ অপছন্দ' নির্দ্ধারণে ব্যগ্র হ'ন বিজলী হাসিয়া বলে, "সব জিনিষ গায়ের ফিট্ মাপ চাই।" জননী তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "সে কিরে দুদিনে যে সব ছোট হ'য়ে যাবে!" কন্যা তাহাতেও বলে, "তা হোক্।"

বিবাহের আয়োজন করিতে করিতে শারদীয় পূজা আসিয়া উপস্থিত হয়। পূজা উপলক্ষে প্রাপ্য দ্রব্যাদির এক বিস্তৃত তালিকা পিতার হস্তে বিজলী প্রদান করিলে জননী হাসিয়া বলেন, "এবারেও সব ঠিক্ ঠিক্ চাই, দুদিন বাদে আবার যে কত চাইরে।" শিশুর মত আব্দার করিয়া বিজলী বলে, "আমি ও সব জানি না আমার চাই-ই।"

কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহে বিজলীর সেই শেষ শারদীয় উৎসবানন্দ। তাহার উৎসবের মত্ততায় জনকজননী পাঁচবৎসরের বিজলীকে আবার যেন ফিরিয়া পা'ন। বিজয়ার দিনে তাহার "ডাকু", "ছাগলী", "পুসী-কে"ও সে ভুলিয়া যায় নাই। শারদীয় পূজার পরে কালীপূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়াও অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে সম্পন্ন হয়। সহোদরেরা রঙ্গ করিয়া তাহাকে বলে, "আস্‌ছে বছর থেকে ভাই-ফোঁটা শ্বশুরবাড়ী থেকেই ত আস্‌বে, ভাল ভাল জিনিষ দিস্ ভাই।" বিজলী হাসিয়া ব'লে, "ক্যা রকম্।" এই 'ক্যা রকম্' তাহার ভাবী শ্বশুরের কথা। তাহা উচ্চারিত হইত লৌকিকতা করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইলে।

আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীবর্গ চিরদিনই বিজলীর উৎসবানন্দে যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সে'বার পূজার আনন্দ শেষ হইতে না হইতেই স্নেহ প্রীতি মিশাইয়া বিজলীর নবীন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠানের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পূর্ণানন্দে সকলে মাতোয়ারা হ'ন। দূর হইতে বিজলী সকলই দেখিত। দেখিয়া উদাস দৃষ্টিতে সীমাহীন নীলাকাশের পানে চাহিয়া সে কি ভাবিত কে জানে!

আত্মসুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সকলের সেবা করিতে সে জানিত এবং সেবা করিত। জনকজননী, প্রাণসম নন্দিনীর সেবায় যে কি সন্তোষ লাভ করিতেন তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। তাহাতে তাহার কি তৃপ্তি কি আনন্দ! বিজলীর মনে হইত যে সে সেবা না করিলে জনকজননীর ক্লেশের সীমা থাকিবে না। যখনই তাহার এ কথা মনে হইত তাহাদের কাছে তখনই সে ছুটিয়া যাইত।

বিবাহের আয়োজন কবিবার গণ্ডগোলে পিতা মাতার সেবা করিবার সুখ হইতেও সে প্রভূত পরিমাণে বঞ্চিত হয়, কেন না আহার নিদ্রা প্রভৃতি সকল বিষয়েই অনিয়মের চূড়ান্ত তাঁহারা করিতেন। বিজলী একদিন পিতাকে ব'লে, "ক্রমেই বাড়াবাড়ি হচ্চে—ওসব চ'লবে না ব'লে রাখ্‌ছি।" "কি হ'ল রে" বলিয়া পিতা উচ্চ হাস্য করেন। কিছু আর না বলিয়া উষ্মা ভরে কন্যা চলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী আসিয়া অভিযোগ করেন, "মেয়েকে খেপিয়েছ কেন?" কন্যার স্নেহ প্রবণতায় পিতা বিচলিত হ'ন যথেষ্টই। তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের শ্রীসৌভাগ্য যাহা কিছু সে সকলই যে তাহার সৃষ্ট! স্নেহময়ী জননীর মত আপনা ভুলিয়া সন্তানের মঙ্গলার্থে সে যে সতত জাগ্রত! সেই ঘরের লক্ষ্মী পরের ঘরে প্রতিষ্ঠা করিতে তো আর বিলম্ব নাই। •তার পর? সেই চিন্তায় যখন তিনি আচ্ছন্ন তখন কোন্ ফাঁকে ঘরে আসিয়া বিজলী কখন যে তাঁহার কাছে উপস্থিত হয় তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।" হাসি হাসি মুখে সে জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁ বাবা আজ বেরুবে না?" বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছিল। কার্ত্তিকের শেষ, শীতের ও বেশ আমেজ্। পিতা হাসিয়া বলেন, "না বাবু বকুনি খেতে পা'রব না।" অনেক দিন পরে পিতা

পুত্রীর হাসি-গল্প! সকল কর্ম্ম ফেলিয়া বিজলীর জননীকেও তাহাতে যোগদান করিতে হয়।

সেই দিনই শুভকার্য্যের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত হইয়া আশীর্ব্বাদের দিন ধার্য্য হয় ১১ই অগ্রহায়ণ। গাত্রহরিদ্রা ও বিবাহের দিন যথাক্রমে ২০শে ও ২১শে অগ্রহায়ণ নির্দ্ধারিত হয়।

আশীর্ব্বাদ

পাত্রের পিতা আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু. বান্ধবের সহিত নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিজলীকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসেন। কন্যাপক্ষীয় আত্মীয় স্বজনও যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। কন্যাকে সভাস্থ করা হইলে সকলেরই কিন্তু বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই। সোণার অঙ্গে এ কী কালিমা! কন্যাপক্ষীয়দের ত কথাই নাই, পাত্রের পিতাও চমকিত হইয়া তাঁহার ভাবী পুত্রবধূর মুখপানে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকেন। লাবণ্যময়ী সে রূপ তাহার কোথায় লুকাইল! প্রফুল্ল কমল কেন আজ এত বিষাদিনী!

যন্ত্র-চালিতের ন্যায় বিজলী সভাস্থলে আসিয়া দেখা দেয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে অভিবাদন করিয়া যন্ত্র-চালিতের ন্যায়ই সভায় সে তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করে। অন্তঃপুরচারিণীগণের মঙ্গল-শঙ্খ নিনাদের সহিত বিজলীর শুভাশীর্ব্বাদ যথারীতিতে হইয়া যায়। কন্যার আকার দেখিয়া পিতা লুপ্ত-চৈতন্য বজ্রাহতের ন্যায় সভার এক কোণে দণ্ডায়মান ছিলেন। আশীর্ব্বাদ হইয়া যাইবার পরে কন্যাকে সভাস্থল হইতে লইয়া যাইবার জন্য যখন তাঁহাকে আহ্বান করা হয় তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গে! কন্যার হাত ধরিয়া সভা-গৃহের বাহিরে আসিলে পিতা অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, "কি হয়েছে মা, এমন 'চেহারা কেন?" কোনো কথা না বলিয়া করুণ-দৃষ্টিতে একবার তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাহার চক্ষু নত হয়। মঙ্গল-শঙ্খ-সুস্বনে দিক্ তখন মুখরিত। মঙ্গল-ঘট বহন করিয়া বিজলী অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। মঙ্গলময়ের চরণে প্রণাম করিয়া বিজলীর জননী নয়ন-পুত্তলীকে তাঁহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়া বক্ষে ধারণ করেন। অলক্ষ্যে থাকিয়া নির্ম্মম বিধাতা তাঁহার অখণ্ড-লিপির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কি করিতেছিলেন কে জানে!

কন্যার নূতন জীবন-যাত্রা ধারার প্রারম্ভেই সেই চির-প্রফুল্ল কমলের বিষাদিনী মূর্ত্তি দেখিয়া পিতার মনে একটা সংশয় ভাবের উদয় হয়। সুযোগ প্রাপ্তি মাত্র কন্যাকে একান্তে লইয়া যাইয়া সস্নেহে তিনি বলেন, "এখন ত বেশ দেখ্ছি, কি হয়েছিল তখন।" কন্যা হাসিয়া বলে, "কেমন ভয় ভয় কর্‌ছিল বাবা।"

পিতা—তাই না আর কিছু? কন্যা—আবার কি? উত্তর শ্রবণে পিতা নিশ্চিন্ত হ'ন। নূতন পথে চলিবার প্রারম্ভে এই 'ভয় ভয়' যে নিতান্ত স্বাভাবিক। ভবিষ্যৎ কাল মেঘের ছায়া-পাতে "সোণার বিজলীর" সোণার অঙ্গ যে মসীময় হইয়া গিয়াছিল তাহা কল্পনাও কেহ করিতে পারে নাই।

প্রাতে আশীর্ব্বাদ সম্পন্ন এবং দিবাভাগে উৎকণ্ঠানন্দিত জনতা তরল হইলে সন্ধ্যার শান্ত-ছায়ার কোলে জনক-জননীর নিকট বিজলী তাহার হৃদয় নিহিত উৎস পূর্ণভাবেই খুলিয়া দেয়। অন্য দিনের মত তাঁহাদের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই সে গায়, "আজি মনে পড়ে কত কথা।" তাহার ছত্রে ছত্রে করুণ সুরে গায়িকার হৃদয়ের অন্তরতম কথা প্রতিধ্বনিত! নীড়চ্যুত হইবার আশঙ্কায় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অভিভূত ভয়ার্ত্ত-কুজনের ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী এই বিলাপে প্রকৃতি তখন যেন স্তব্ধ। সেই স্তব্ধতার মাঝে সন্ধ্যার ঘন-ছায়ায় আবৃত হইয়া দুইটী বিষাদিত প্রাণ নীরব নীথর! কতক্ষণে গান শেষ হইয়া যায়, কাহারও মুখে কোনো কথা নাই—কথার সূত্র সকলে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। গান শেষে আবার কতক্ষণ পরে বিজলী বলে, "ঘুম্ পাচ্ছে, আর গান থাক।" সেই দিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নিদ্রিতা জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বিজলীকে শয়ন করিয়া থাকিতে পিতা দেখেন। রাত্রিতেও শয়ন কক্ষে যাইয়া তিনি দেখেন মাতা ও কন্যা সেই ভাবেই নিদ্রিতা। দেখিয়া চক্ষু তাঁহার আর্দ্র হয়।

অধিবাসরে

আশীর্ব্বাদের দিন হইতেই বিজলীর পিতৃগৃহে আত্মীয় প্রভৃতির যাতায়াত আরম্ভ বেশই হয়। শুভকার্য্যের প্রয়োজনীয় "খুটিনাটির" ব্যবস্থা করিতে বসিয়া এবং তাহা করিয়া দিয়াও বিবাহোপলক্ষে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিবার অবসরও তাঁহাদের থাকিত যথেষ্ট। একদিন

কন্যা ও জামাতার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের মধ্যে একজন বিজলীর সাক্ষাতে সহাস্যে তাহার জননীকে বলেন, "মেয়ের কাছে ঋণ তো বড় কম্ করনি।" সে কথায় বিজলী বলিয়া ফে'লে "এতেও পার্ নেই।" একটা হাসির তরঙ্গ তখন বহিয়া যায়। বিজলীর মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী ব'লেন, দেখ্ ছোট বৌ কথা শুনিস্, র'য়ে ব'সে দিস্, সম্বছর প'ড়ে রয়েছে।" "বুদ্ধির গেরো" দিয়া বাঁধন দৃঢ় করিতে মানুষ যতই যত্ন করে কোথা হইতে কেমন করিয়া যে তাহা শিথিল হইয়া যায় বুদ্ধির মাপ-কাটি দিয়া তাহার নিরাকরণ করিতে এ পর্য্যন্ত তো কেহ পারে নাই।

মানুষের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় যতদূর হইতে পারে প্রাণপণ শক্তিতে তাহার শেষ সীমায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বিজলীর বিবাহের আয়োজন সকলে মিলিয়াই করেন। লৌকিকতা করিয়া কর্ত্তব্য 'হাসিল' করিবার কল্পনাও কেহ করিতে পারেন নাই। সে কথার উল্লেখ তাঁহাদের কাছে করিয়া গৃহস্বামী বলেন, "বিজলীর কাছে ঋণ শুধু আমরা করিনি, করেছেন অনেকেই দেখ্ছি।"

প্রীতিময়ী বালিকার স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে পল্লীস্থ প্রায় সকলেই একে একে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। বিজলীর "বুড়ো ছেলে" মল্লিক মহাশয়, মালতীর পিতা রঘুনাথ বাবু, মানুর 'বাবা' অনিলবরণ বাবু আরও অনেকে সুদ্ সমেত ঋণ শোধ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করেন নাই। মল্লিক মহাশয় তাঁহার বিস্তৃত বাসভবন "মা লক্ষ্মীর" বিবাহের জন্য ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখিয়া দেন। অসুস্থ দেহ লইয়া ছুটাছুটি তাঁহার দেখে কে। বিজলীর পিতা নিষেধ করিলে তিনি নিষেধ মানেন নাই, বলিয়াছেন—বিজলী কি শুধু আপনার!

বিজলীর সঙ্গিনীরাও নিজ নিজ গৃহ-কর্ম্ম ফেলিয়া 'হামেহাল হাজির।' প্রিয় সখীকে একদণ্ডও ছাড়িয়া থাকিতে আর তাহারা প্রস্তুত নহে। "মানু" ছুটিয়া গিয়া তার মাসীমাকে (বিজলীর জননী) জিজ্ঞাসা করে "হ্যাঁ মাসিমা, বিজলী দিদির ওপর আমাদেরি তো জোর বেশী? তাহ'লে শ্বশুর বাড়ীতে বেশী দিন বিজলী দিদি থাক্'তে পাবে না।" মালতীর মুহুর্মুহু অভিযোগ, "বিজলী দিদি শ্বশুর বাড়ী যাবে কেন—তা বল!" "বিজলী দিদি" তাহাদের কথা শুনিত আর তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিত।

বিমান, বিকাশ, বিজয়ের আহার নিদ্রার অবসর নাই। সারাদিন ঘুরিয়া যেখানে যাহা পাইয়াছে বোন্‌টীর জন্য আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকিত বোন্‌টীর কাছে বসিয়াই গল্প করিত। মোহন, কণক, তুলসী, অমর (বিজলীর জ্যেষ্ঠতাত ও পিসিমাতাদিগের পুত্রেরা) কেহই বিজলীর বিবাহে "ফাঁকি" দিতে পারে নাই! স্নেহের ঋণ এমনি!

প্রভাস দিনের মধ্যে 'দশবার' আসিয়া 'গলাবাজি' করিয়া "বিয়ে বাড়ী সরগরম্" করিতে বসিত আর তার কনিষ্ঠদের (প্রবোধ ও প্রতুলকে) গম্ভীর ভাবে বলিত "ওহে বাবু ফাঁকি দিও না।"

সর্ব্বজন-প্রিয় বিজলীর উদ্বাহ-অধিবাসরে সকলে যখন এই ভাবে মত্ত তখন বহু দূরের যাত্রী যেমন যাহা কিছু তাহার প্রিয়, যাহা কিছু তাহার মনোরম সব ত্যাগ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে অযুত ঐরাবতের শক্তি সম্পন্ন হইলেও প্রথম পদক্ষেপে অস্থিরতা প্রকাশ করে তেমনি সহিষ্ণুতায় ধরিত্রী-সদৃশা হইয়াও ব্যথাহত-হৃদয়ের গোপন কথা শত চেষ্টাতেও গোপন রাখিতে বিজলী পারে নাই। আশীর্ব্বাদান্তে সন্ধ্যা সমাগমে তাহার সেই করুণ রাগিণীর-প্রতিধ্বনিই তাহার কাকলীতে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

গাত্রহরিদ্রা ও বিবাহ

২০শে অগ্রহায়ণ! বিজলীর আজ গাত্রহরিদ্রা। পূর্ব্বাহ্নে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়া যখন সকলে শয্যাগ্রহণ করেন তখন রাত্রি অবসান হইবার আর অধিক বিলম্ব ছিল না। আধ-ঘুমে আধ-জাগরণে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দিয়া অরুণোদয়ের অনেক পূর্ব্বে সানাইয়ের ভোরাই-সুরে সকলে উঠিয়া পড়েন। যেখানে যেটী প্রয়োজন যেখানে যাহা শোভনীয় সমস্তই প্রস্তুত থাকায় উৎসবরাণীর অঙ্গরাগ-উৎসব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে "এয়োরাণীরা" একে একে আসিয়া রঙ্গের উৎস প্রবাহিত করিয়া দেন'। হাসি-রঙ্গে সকলেই বিভোর। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এত উৎসাহ এত রঙ্গ-ভঙ্গ প্রাণ-পণ আয়াসে নিজেকে গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেও কুমারী জীবণের শেষ দিনটীকে বিদায় করিয়া দিবার সকলের বিপুল আয়োজনে ব্যথা বেদনায় সে কাতর হইয়া পড়ে। কিন্তু উপায় কি? সংযত হইয়া তাঁহাদেরই হাতে আত্মসমর্পণ তাহাকে

করিতে হয়। আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে যথা সময়ে গাত্র-হরিদ্রা সম্পন্ন হইলে শুভ-স্নানাদির পরে চারুসজ্জায় তাহাকে সজ্জিত করিতে আত্মীয়াদের মধ্যে ব্যগ্র অনেকেই হ'ন। জননী কর্তৃক সজ্জিত হইবার বাসনাই বিজলী শান্তভাবে প্রকাশ করে। তাহার জীবনের যুগপরিবর্ত্তনের সময়ে "পর" করিয়া দিতে জননী তাহার কিভাবে সজ্জা করিয়া দে'ন তাহা দেখিতে সাধ বোধ হয় তাহার হয়। জননীই তাহার সজ্জা করিয়া দে'ন। সজ্জা শেষে কন্যার আগ্রহে পিতা সেই স্থানে আসিলে সুসজ্জিতা বালিকা তাঁহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কন্যাকে বক্ষে ধারণ করতঃ তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া পিতা বলেন, "মা আমার রাজরাণী হও।" তাহার চিরাভ্যস্ত প্রীতি-হাস্যে হৃদয় তাঁহার মথিত করিয়া দিল না। কেবল পিতার বক্ষলীন হইয়া "পর" যে সে তখনও নহে তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিল।

আত্মীয়া ও সঙ্গিনী পরিবৃতা কন্যার আয়ুর্বৃদ্ধ্যান্ন সম্পন্ন হইবার সংবাদ শঙ্খধ্বনিতে "চারিভিতে" প্রচারিত যখন হয় তখন অক্ষম মানবের প্রগলভতায় যাঁহার হাসিবার তিনি হাসিয়াছিলেন নিশ্চয়ই। অন্ধজীবের আনন্দোৎসবের হ্রাস-বৃদ্ধি কিন্তু তাহাতে হয় নাই।

পরদিন বিবাহোৎসব। হাসি ফুল গানের ছড়াছড়ি! আলোক-মালায়, গৃহ-সজ্জায় বিবাহ বাটীর অপরূপ শোভা! সকল শোভা-সম্পদের শীর্ষে রাজরাজ্যেশ্বরীর ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিতা উৎসব-রাণী শত প্রশংসমান চক্ষুর কেন্দ্র হইয়া অপূর্ব্ব প্রভায় প্রভান্বিতা! নারায়ণী যেন নারায়ণের ধ্যানে ধ্যানস্থা!

নির্দ্ধারিত সময়ে—রাত্রী দশ ঘটিকায় ব্রাহ্মণ ও সভাস্থ সকলের অনুমতি গ্রহণান্তর সম্প্রদান করিবার জন্য কন্যা আনীত হইলে দেবতা অগ্নি ও ব্রাহ্মণ সাক্ষ্য রাখিয়া গৃহকর্ত্তা যখন কন্যা সম্প্রদানে উদ্যত আকস্মিক একটা হাহাকারে তখন হৃদয় তাঁহার পূর্ণ হইয়া যায়। কন্যার হস্তস্পর্শ করিবামাত্র পিতা বুঝিতে পারেন যে সেও থর থর কম্পান্বিতা। মুখপানে চাহিয়া দেখেন সজল-আনত-নয়ন তাহার নিদারুণ ব্যথায় বর্ষণোন্মুখ! 'মা মা' বলিয়া কন্যাকে সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে পিতা আত্মদমনে অসমর্থ হইয়া পড়েন। কম্পিতস্বরে জামাতার উদ্দেশে তিনি

বলেন "হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে সংসারের দুর্লভ রত্ন তোমায় দান করলুম সুখে রেখো সুখী হবে।" কন্যা সম্প্রদান হইয়া যাইলে লোকে বড় গলা করিয়া বলে, "শুভমুহূর্ত্তে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।" মুহূর্ত্তের স্রষ্টা যিনি তাঁহার অভিমত যে তখনো অবিদিত!

পিতৃমাতৃকুলের বহু ব্যক্তি ও পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই 'ভুলচুকে' নিমন্ত্রিত না হইলেও আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। নিজ কন্যা বা সহোদরার বিবাহ জ্ঞানে প্রতিবেশীবর্গ বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারেন নাই। জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্নি ও কলিকাতার গণ্যমান্য চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অন্তঃপুরে পর্দ্দানশীন ও পর্দ্দাবিরোধিনীরা বিজলীর বিবাহ-বাসরে একমন একপ্রাণ। সমবেত সকলের শুভেচ্ছায় শুভকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইলে তবে তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। যাইবার পূর্ব্বে বিজলীর নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়া "পা বাড়'ইতে" অনেকেই পারেন নাই। বড় আদরের বিজলী তাঁহাদের পরগৃহে চ'লিয়া যাইবে যে!

অসুস্থতা নিবন্ধন গুরুদেব বিবাহে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শিষ্যকে যে পত্র তিনি লিখেন তাহার কিয়দংশ এই:—"যাঁহারা বধূরূপে মা লক্ষ্মীকে লইয়া যাইতেছেন তাঁহারা যথার্থই ভাগ্যবান। * * * এই বালিকা দেবতার পবিত্র নির্ম্মাল্য। তাঁহার উপযুক্ত সমাদরের অভাব যেন কখনো না হয় * * *"

বর-কন্যা 'বাসরে' বসিলে 'ফ্যালা' (জ্যেষ্ঠমাতুল পুত্র) তাহারই সাক্ষরিত দুই প্রস্থ পদ্য তাহাদের দুইজনের হাতে দিয়া বলে, "জামাই বাবু প'ড়ে দেখুন বিয়ের পদ্য।" গাধার ডাক ডাকিতে ফ্যালা চমৎকার পারিত। সুবিধা করিতে পারিলেই সেই ডাক ডাকাইয়া ফ্যালাকে 'লাল' করিয়া দিয়া বিজলী তবে ছাড়িত। "বিয়ের পদ্যের" পক্ষপাতিনী বিজলী কখনই ছিল না। পদ্যোচ্ছ্বাস তাহার বিবাহে অশোভন হইবে মনে করিয়া 'কবিচন্দ্র' প্রভৃতি অনেককে কবি-যশ-লোভ ত্যাগ করিতে হয়। নগ্নাকারে 'গাধার ডাক' ও যে বিবাহ-বাসরে শোভন নহে সে জ্ঞান ফ্যালার ছিল। পদ্যের আবরণে—সেই কারণেই তাহার সেই স্বচ্ছন্দ! ফ্যালার সেই বাসর-উপহার, গানুর স্বরচিত 'মিলন-সঙ্গীত'

ও মালতীর স্বচ্ছ-আনন্দ বিজলীর বাসর-উৎসবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রাণপ্রিয় বালক বালিকাদিগের নির্ম্মল আনন্দ-ধারায় কত কথা ভাসিয়া আসিয়া নূতন পথের নূতন যাত্রীটীর কাণে কত নূতন কথার ইঙ্গিতই করে!

আনন্দের উত্তেজনায় বিবাহরজনী অতিবাহিত করিয়া ছিন্ন বাসিফুলের একটা রাজত্বে সকলে আসিয়া পড়ে। তখন অর্থহীন তাহাদের দৃষ্টি উৎসাহহীন তাহাদের গতি। তিনমাসব্যাপী বিরাট আয়োজনের ফলে পূর্ণাহুতি দান সুশৃঙ্খলে যে হইয়া গিয়াছে। সকলের ললাটে যজ্ঞ-তিলক তাহার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য। সেই তিলকধারণে সকলেই অবসন্ন!

চিরানন্দময়ীর চক্ষে অশ্রুর বন্যা। পিতা অব্যবস্থিত চিত্ত, জননী উদ্দেশ্য-হীন, সহোদরবর্গ স্থাণুবৎ! চিরাভ্যস্ত স্নেহ-নীড় ছাড়িয়া স্নেহময়ীর অন্যত্র গমনের বিদায়-সম্ভাষণের ব্যবস্থা নিকট-আত্মীয়াদিগের দ্বারাই করা হয়। কন্যার যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে পাষাণে বুক বাঁধিয়া জননী মাঙ্গলিক কার্য্যাদির আয়োজনে ব্যগ্র হ'ন। অশ্রুমুখী নন্দিনী পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া অশ্রুনীরে তাঁহার বক্ষ ভাসাইয়া দেয়। অবস্থাবিশেষে নির্ম্মম অপরাধীও যেমন দ্রবীভূত হয় রোদনকাতরা কন্যার মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া পিতারও তখন সেইমত অবস্থা। পিতাপুত্রীর আচরণে গৃহিণী তিরস্কার করিয়া বলেন, "তোমরা করছ কি?" উত্তর কে দিবে, কি দিবে? কন্যাকে সঙ্গে লইয়া জননী চলিয়া যা'ন—রাজরাণীর বেশে সজ্জিতা করিয়া স্বামীগৃহে তাহাকে পাঠাইবার আয়োজন করিতে।

গুরুজনের আশীষ মাথা পাতিয়া লইয়া শত প্রশংসমান চক্ষুর সম্মুখ দিয়া পরিণীতা বিজলী যখন স্বামী গৃহে গমন করে পল্লীস্থ কাহারো পক্ষেই অশ্রুরোধ করা তখন সম্ভবপর হয় নাই। আর বিজলী! শ্রাবণ ধারার অশ্রুবর্ষণের পর শরতের আকাশের মত নির্ম্মল!

বরকন্যা বিদায় হইবার পরেই "পুষী" কোথায় যে চলিয়া যায় আর ফিরিয়া আসে নাই। 'ডাকু' সারারাত্রি ডাকাডাকি করে। পরদিনে কেহ তাহাকেও দেখিতে পায় নাই।

নূতন সংসারে

বিজলী যখন যেখানে সেখানকার রূপ তখনি আপনা হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবার অনতিবিলম্বে এই মহিমময়ী বালিকার পূত-প্রভাব মনে প্রাণে সকলেই অনুভব করে। বালক

পরিণীতা—

বালিকারা নববধূর স্নেহাকর্ষণে নিজ নিজ জননীর কথা ভুলিয়া তাহারই সন্নিকটে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাল কাটাইয়া দিতে উৎসাহান্বিত হয়। পুত্রবধূর সহিত গল্প করিতে পাইলে শ্বশুর আর চাহিতেন না কিছুই। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী একদৃষ্টে বধূর প্রতি চাহিয়া থাকিতেন আর গর্ব্ব করিয়া লোকের কাছে বলিতেন, "অনেক তপস্যা ক'রে এমন বৌ পাওয়া যায়।" ননদিনীরা "রায়বাঘিনী" হইবার ইচ্ছা করিলেও হইতে পারিতেন না। অজাতশত্রু হইয়াই বিজলী জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা, দীক্ষা, প্রকৃতি-মাধুর্য্য ও আভিজাত্যের ফলে সকলকে আপনার করিয়া লইতে কালবিলম্ব কোনোকালেই বিজলীর হয় নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও ননদিনীরা তাহাকে 'সোণারচক্ষে' দেখেন। 'বৌদিদির' রূপ-গুণ দেখিয়া শুনিয়া দাসদাসীরাও তাহার গুণগানে মুখরা হয়। পিতৃগৃহের লক্ষ্মী এমনি করিয়াই পতিকুলের কুললক্ষ্মীর আসন নিমিষে অধিকার করিয়া বসে। কে বলিবে তখন —দুইদণ্ডপূর্ব্বের এই সেই অশ্রুমুখী বালিকা।

পিতা আসিয়া দেখেন—তাঁহার বুকের ধন শ্বশুরকুলের পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের পর্য্যন্ত হৃদয় অধিকার করিয়া নিমেষে এক বিস্তৃত নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়া আছে। বৈবাহিক গর্ব্ব করিয়া বলেন— বিজলীকে তাঁহারা 'বশ' করিয়া ফেলিয়াছেন। কনিষ্ঠাননদিনী 'তালুই' মহাশয়কে বলে, 'বাবা বৌদিদিকে আপনি নিয়ে গেলে থাকবো কি ক'রে আমরা তাকে ছে'ড়ে।' জ্যেষ্ঠাননদিনী কন্যার সোহাগের আব্‌দার "মামীমাকে নিয়ে যাবেন না।" অন্তরালে থাকিয়া বৈবাহিকা জানাইয়া দে'ন যে বিজলী তাঁহাদের পক্ষে 'অপরিহার্য্য।' সকলের কথা শুনিয়া কন্যার পানে পিতা চাহিয়া দেখিবামাত্র মধুর হাস্যে পিতৃপদে সে যেন নিবেদন করে, "তোমাদের বিজলী তোমাদের ছাড়িয়াও কর্ত্তব্য ভুলে নাই।" একটীদিন মাত্র—নূতন সংসারের সহিত বিজলীর তখন পরিচয় হইয়াছে। একদিনেই 'যাদুকরী' তাহার অমোঘ যাদুবিদ্যা বলে, সকলকে সম্মোহিত করিয়া দেয়। পিতা সকলকে স্মরণ করাইয়া দে'ন, যে কন্যার অনুপস্থিতি জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যাস করিবার সময়ও তাঁহাদের পক্ষে 'অপরিহার্য্য।'

পরদিন ফুলশয্যা এবং তদুপলক্ষে মহিলাদিগের প্রীতিভোজ। কন্যা জামাতার জন্য 'ষোড়শোপচারে' উপঢৌকনাদি প্রেরণান্তর বিজলীর জননী

নূতন কুটুম্বের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী এবং মাতুলানী প্রভৃতি অনেকে সেই ভোজে উপস্থিত থাকেন। সকলেরই এক কথা, "শ্বশুর বাড়ীর সকলকে গোলাম করে ফেলেছে বিজলী।" তৎপর দিবস 'ধূলা-পায়ে' লগ্ন করিবার জন্য কন্যা পিত্রালয়ে প্রাতে আগমন করে এবং অপরাহ্নে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করে। অবস্থান-কাল (পিতৃগৃহে) অল্পক্ষণের জন্য হইলেও জনক-জননী ও সহোদরবর্গের সহিত মিলনানন্দ পূর্ণভাবে ভোগ করিতে বিজলীর উৎসাহের সীমা থাকে নাই।

শ্বশুরালয়ে উৎসবের শেষে সকলের স্নেহ মমতার অধিকারিণী হইয়া অষ্টাহে জনক-জননী ও সহোদরবর্গের নয়নের মণি পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃগৃহ উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করে।

উৎসবানন্দে

বিজলীর প্রত্যাগমন-সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র নিকট আত্মীয়াদিগের মধ্যে অনেকে এবং সঙ্গিনীদিগের সকলেই একে একে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবসর মালতীর ছিল না। প্রশ্ন একই—এ সব কি কথা, এত দেরী বিজলী দিদির কেন? "মা" "বাবা" "বিজলী দিদি"—সকলকেই সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। শেষে সেই স্থির করে, আসুক বিজলীদিদির শ্বশুর ব'লতে তাঁকে হবে এ কথা। সঙ্গিনীদিগের কলকণ্ঠ, আত্মীয়বর্গের হাস্য-পরিহাস ও সহোদরত্রয়ের প্রফুল্লতায় কয়দিন যাবৎ প্রাণহীন সেই গৃহ আনন্দ-কোলাহলে আবার মুখরিত হয়।

আত্মীয়ারা একান্তে বিজলীকে লইয়া যাইয়া 'শ্বশুরবাড়ীর কথা' একটী একটী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বিজলী হাসিয়া বলে, "বাবা তো সবই জানে।" সাধ্য সাধনা করিয়াও, ইহার অধিক তথ্য তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

শীঘ্র "নূতন জামাই" আনিয়া সকলের একটা 'উপরি' আনন্দের খোরাক্ গৃহস্বামী করিয়া দে'ন। বিজলীর "খুড়োর" (পিতার এক খুল্লতাতের পুত্র অনিলপ্রসাদ) দর্শন সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায় বিজলীর বিবাহোপলক্ষে। 'কুটুম্বের' মত আসিয়া প্রথমে সে দাঁড়ায়। সেই 'লাজুক,' চঞ্চল আত্মীয়টীর ব্যাপার এক 'আঁচড়েই' বিজলী বুঝিতে

পারে এবং 'এটা সেটা' তাহাকে করিতে বলে। 'খুড়ো' তখন একাই একশত। বর-কন্যা বিদায়-কালে এক দিনের পরিচিত ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য তাহারও চক্ষু অশ্রুশিক্ত হয়। নূতন জামাতার সম্বর্দ্ধনার ভার অনিলই গ্রহণ করে এবং তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের জন্য ব্যবস্থাদি করিতেও সে অগ্রণী হয়। অনিলের 'কাজের ঝোঁক' এবং "একসঙ্গে গরম বেগুনভাজা খাওয়ান ও শব দাহের ব্যবস্থা করিবার" গল্প করিয়া তাহাকে 'নাস্তানাবুদ' করিতে বিজলী চেষ্টা করিলেও অনিল হাসিমুখে বলিত, "সত্যিই ত তাই করেছিলুম, হয় নয় খবর নাও।" অনিলের এই প্রকার কার্য্যকুশলতার গল্পে সকলের আনন্দের মাত্রা বিজলীর কল্যাণে বর্দ্ধিতই হইত।

পৌষ মাসের সমস্তটাই এই ভাবে চলে। কখনো বিজলীর শ্বশুর কখনো বা দেবর আসিয়া সে আনন্দের অংশ গ্রহন করিতেন যথেষ্টই। বিজলীর শ্বশুরালয় সম্পর্কীয় বালক বালিকারাও বিজলীর কাছে ছুটিয়া আসিত।

পৌষ-পার্ব্বনে সমারোহ করিয়া জনক-জননী, সহোদরবর্গ, আত্মীয় বন্ধু, প্রতিবেশী সকলকে পিঠাপুলী খাওয়ান বিজলীর বার্ষিক কার্য্য। "আউনি বাউনি তিন দিন ধরে পিঠা ভাত খাউনি"। শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রতি হিন্দু-গৃহের কুললক্ষ্মীরা 'বাউনি' বাঁধিয়া 'পিঠে ভাতের' আয়োজন কেমন করিয়া করিতেন তাহার গল্প বাল্যে বিজলী প্রথম যেদিন শুনে সেইদিন হইতেই বাঙ্গালীর নিজস্ব সেই উৎসব সম্পন্ন করিতে সে উৎসাহান্বিতা হয়। বিবাহোৎসবহেতু অবসাদের পরে পৌষপার্ব্বণে সমারোহ করিতে কন্যাকে পিতা নিষেধ করেন। বিজলী বলে, "না বাবা হোক্"। সে বৎসর তাহার শ্বশুরালয়ের সকলেই সেই উৎসবে যোগদান করিতে অনুরুদ্ধ হ'ন। যোগদানও তাঁহারা করেন। স্বহস্ত প্রস্তুত নানাবিধ পিষ্টকাদি সকলকে সমাদর করিয়া খাওয়াইতে বিজলীর কী আনন্দ!

পৌষ-পার্ব্বণে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া মাঘ মাসের প্রারম্ভেই নিজগৃহে 'অল্পদিনের জন্য' বিজলীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব বিজলীর শ্বশুর করেন। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সে প্রস্তাব গৃহিত হয়। বিদায় যখন সকলে গ্রহণ করেন তখন রাত্রি অনেক। বধূকে দেখিতে আসিয়া রাত্রি ১১ ঘটিকার পূর্ব্বে গৃহ-প্রত্যাগমন শ্বশুর কখনোই করিতে পারিতেন না।

অল্পদিনের জন্য বলিয়া লইয়া যাইলেও বিজলীকে তাঁহারা শীঘ্র ছাড়িয়া দেন নাই। "বশ" বিজলীকে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই একটা ধারণা তাঁহাদের হয়। অসুস্থা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবায় ও সংসারের সকল কার্য্যের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণে ও তাহা সম্পাদনে তাহার স্ফূর্ত্তি দেখিয়া গৃহস্থের সেরূপ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। পিতা-পুত্রীর গোপন কথার বিন্দুমাত্রও যে তাঁহারা অবগত হ'ন নাই। পিতাকে একান্তে পাইলেই কন্যা বলিয়া দিত, "যতদিন এখানে থাক্‌বো রোজ্ তোমায় আস্‌তে হবে বাবা—ভায়েরাও সুবিধা পেলেই যেন আসে।" মনোবেদনার উপশম কন্যা এই ভাবেই করিত আর 'বিয়ের কণে' হইয়াও একটা নূতন সংসারের পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া হাসিমুখে সকল কার্য্য করিতে যত্নের তাহার সীমা থাকিত না। বধূর কার্য্যকুশলতা ও তৎপরতার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্যের ভারই ধীরে ধীরে তাহার হস্তে অর্পিত হয়। কার্য্যেই বিজলীর আনন্দ কার্য্যেই তাহার সত্বা। তাহারই আনন্দে বিজলী পিতৃমাতৃ-বিচ্ছেদজনিত নিরানন্দ ডুবাইয়া রাখিত। কে তাহার সন্ধান রাখে?

আদরের পুত্রবধূ হইলেও তাহার পূজাপাঠের ব্যাঘাত শ্বশুরালয়ে যথেষ্ট হওয়ায় অসচ্ছন্দতায় সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কোনো প্রকারে একথা জানিতে পারিয়া সে অসুবিধা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা শীঘ্রই হয় এবং বিজলীকে দিয়াই শ্বশ্রূঠাকুরাণী "লক্ষ্মী পাতাইয়া" নে'ন। 'লক্ষ্মীপাতার' অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুরের একটা "যাওয়া" টাকার "কিনারা" হইয়া যায়। এই ব্যাপারের পর হইতে যথাভিরুচি পূজাকর্ম্মাদির স্বাধীনতা বিজলী লাভ করে।

মাঘের শেষে সরস্বতী পূজায় পিতৃগৃহে আগমন করিবার জন্য কয়েকদিনের অবকাশ বিজলী প্রাপ্ত হয়। পিতৃগৃহে আসিয়া সে দেখে প্রতিমা তখনো আনা হয় নাই। প্রতিমা আনয়নের ব্যবস্থা সে তখনি করিয়া লয়।

হেমন্ত অবসান প্রায়। আকাশ, বাতাস, পিক, তরু, লতা সকলের অঙ্গেই শিহরণের সাড়া! কুন্দেন্দুতুষারহারা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা বীণাদণ্ড-

মণ্ডিতকরা কমললোচনা দেবী সরস্বতীর দিব্যদৃষ্টি যে সকলকেই জাগাইয়া দিয়াছে! তাই না আকাশ ধূম্রছায়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে পঞ্চমীর চাঁদের সঙ্গে ক্রীড়ারঙ্গে অত আত্মহারা! দখিন্ বাতাসের হিম-ঋতুর প্রতি কি ভ্রুভঙ্গি! বসন্তসখা পঞ্চমে মধুর তান তুলিয়া তরু-লতার অঙ্গে লীন—সোহাগ কত! সর্ব্বত্র জড়তা অপসারিত। দেবী ভারতীর শুভাগমনে, বীণাবাদিনীর বীণার ঝঙ্কারে দিক্ মুখরিত। এমনদিনে পঞ্চমীর শ্রী ফিরিবে না তো আর কবে ফিরিবে! সবাই সাড়া দিয়াছে— বিদ্যাদায়িনীর সম্মোহন সঙ্গীতে সকলেই সচকিত। হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য সাজাইয়া দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে সেবিকা বিজলীও সচঞ্চল না হইয়া থাকিবে কেমন করিয়া?

যথাবিধি দেবীর পূজা, ভোগ, আরত্রিক সমাপন করাইয়া, পরদিন দধিকর্ম্ম, নিরঞ্জন, বিদায়বরণ প্রভৃতি সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বিজলী নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। জননী অসুস্থা হইয়া পড়ায় সকল কার্য্যের ভার যে তাহারি উপর। প্রতিমা বরণ করিয়া সোহাগ ভরে দেবীর কাণে কাণে বিজলী বলিয়া দেয়, "বৎসরান্তে এমনি করিয়া হাসাইতে খেলাইতে আসিও মা।"

পূজোপলক্ষে স্বামী, শ্বশুর, দেবর প্রভৃতি শ্বশুরালয়ের অনেকেই তাহার পিত্রালয়ে আগমন করেন। পূজাকার্য্যাদিতে বিজলীর অপরিসীম উৎসাহ দর্শনে তাঁহাদের কি মনে হয় তাঁহারাই বলিতে পারেন। কিন্তু যেদিন তাঁহাদেরই বাটীতে কক্ষগাত্রাবদ্ধ আলমারীস্থিত লক্ষ্মীদেবী ধীরে ধীরে ভূমিতলে অবতরণ করিবার উপক্রম করেন, আর সমবেত তাঁহাদের সকলের চেষ্টায় আলমারী সমেত দেবী ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার হস্ত হইতে কোনোমতে রক্ষাপ্রাপ্ত হ'ন সেদিন ভক্তিমতী তাঁহাদের কুললক্ষ্মীর শরণাপন্নই তাঁহাদের লইতে হয়। বিজলী তখন হাসিয়া বলে, "দেয়ালে গেঁথেও তাহ'লে ঠাকুরকে আট্‌কান যায় না।" "ঠাকুরকে" প্রসন্ন করিতে বিজলীকে শীঘ্রই শ্বশুরালয়ে যাইতে হয়।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি বিজলী পিত্রালয়ে আগমন করে। কন্যা এই সর্ত্তে আনীত হয় যে চৈত্র মাসের পরে বৈবাহিক বধূ লইয়া যাইতে পারেন, তৎপূর্ব্বে নহে। পিত্রালয়ে আগমন করিবার সপ্তাহ কাল

অতীত হইতে না হইতেই পত্র আসিয়া কিন্তু উপস্থিত—যেহেতু তাঁহাদের উড়িয়া পাচক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে সেই হেতু চারিমাস মাত্র বিবাহিত বধূর সেই দায় হইতে তাঁহাদের উদ্ধার করা অত্যাবশ্যক। উড়িয়া পাচকের দুর্ভিক্ষ কলিকাতায় তখন না হওয়ায় বৈবাহিক পক্ষের অনুরোধ রক্ষা করা সমীচীন বলিয়া কন্যার পিতা মনে করেন নাই। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিজলী পিতার মুখ পানে চাহিয়া থাকে। গৃহিনী বলেন, "এটা কি ভাল হয়!" সে কথায় পিতা কন্যার উদ্দেশে বলেন, "কি করবো?" তাহার উত্তর পাওয়া যায় নাই। কন্যা আনত মুখে বসিয়া থাকে। এই মহাপ্রাণ বালিকার ঔদার্য্যে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করাই এ স্থলে কর্ত্তব্য বলিয়া পিতা মনে করেন। সেই মত সংবাদও যথা স্থানে প্রেরিত হয়। যে কারণেই হউক বধূ লইয়া যাইবার কথা আর উঠে নাই। চৈত্র মাস ভোর জনক জননীর স্নেহ-নীড়ে বাস করিবার সুযোগ সুতরাং বিজলী প্রাপ্ত হয়।

সোণার পিঞ্জরে

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের অধিকাংশ দিনই শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিতে বিজলীকে হয়। এই সময়ে পিতৃদর্শন ও তাহার ভাগ্যে অনেক দিন ঘটে নাই কারণ, পূর্ব্বের মত পিতা তাহার শ্বশুরালয়ে নিয়মিতভাবে নিত্য যাইতেন না। ইহার জন্য পিতা ও পুত্রী উভয়কেই কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা যে ভোগ করিতে হয় তাহা তৃতীয় ব্যক্তির কল্পনাতীত। সে কারণে বিজলীর কর্ত্তব্যে অবহেলা একদিনের জন্যও ঘটে নাই। সব ব্যথা সব বেদনা অন্তরে রাখিয়া হাসিমুখে পতিকুলের হিতসাধনোদ্দেশে মূর্ত্তি কল্যাণময়ীরূপে বিচরণ সতত সে করিত। তাঁহাদের কেহ কেহ বোধ হয় তাহার সেই ব্যথার একটা ক্ষীণ আভাষ কোনো ক্রমে প্রাপ্ত হ'ন। সেই সময়ে বধূর পিতা উপর্য্যুপরি কয়দিন যাতায়াত বন্ধ রাখেন। বিজলীর দেবর তাঁহাকে তাঁহাদের বাটীতে যাইবার কথা বলিতে আসে। সেদিন যাওয়া না ঘটায় পরদিন প্রাতে কুটুম্ববাড়ীর ভৃত্য বিজলীর একখানি পত্র পিতার হস্তে প্রদান করে। তাহাতে লেখা:—"বাবা, কাল এ'লে না কেন? বড্ড রাগ আমি করি'ছি। আজ আসা চাই-ই কোন কথা শুনবো না—আ'সতে হবে। এসো বাবা।" কন্যার অনুরোধ রক্ষা

পিতাকে করিতে হয়। কুটুম্বগৃহে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র বৈবাহিক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতলে বধূর কক্ষে লইয়া যাইয়া তাহাকে বলেন, "এই নাও তোমার বাবা এসেছে।" বৈবাহিককে সম্বোধন করিয়া তিনি সহাস্যে বলেন, 'হুকুম মানতে হ'লো তো (বিজলীর দিকে চাহিয়া) ও বড় শক্ত ঠাঁই।" পত্র যে তাঁহাদের অনুরোধে লিখিত হয় সেকথা পিতা তখন বুঝিতে পারেন। পিতার পার্শ্বে আসিয়া বিজলী দাঁড়াইলে আদর করিয়া তাহাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া বৈবাহিককে তিনিও সহাস্যে বলেন, "কাপুরুষ।" একটা প্রীতি-হাস্যের তরঙ্গে কক্ষ উচ্ছলিত হয়। পিতাপুত্রীতে গল্প করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া যায়। বিজলীর মধ্যমজ্যেষ্ঠতাতের পৌত্রীর বিবাহের কথা তুলিয়া বৈবাহিক নিজেই বলেন, "বিজলী ক'দিন তোমার কাছে থেকেই আমাদের হ'য়ে নেমন্তন্ন রাখবে।" সেই বন্দোবস্তই পাকা হয়। ভ্রাতুষ্পুত্রীর গাত্রহরিদ্রা দিবসে পিত্রালয়ে বিজলী আসে। বিবাহাদি শেষ হইয়া যাইলে শ্বশুরালয়ে আবার সে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখও শেষ হইয়া যায়।

বিবাহোপলক্ষে মধ্যমজ্যেষ্ঠতাতের আলয়ে বিজলীর সমাদরের সীমা ছিল না। সকলের সম্মুখে বিজলীর প্রশংসায় 'মেজমা" বিবাহবাটী বিজলীর পক্ষে অতিষ্ঠ করিয়া তুলেন। "বৌদিদিরা" ও জ্যেষ্ঠতাতকন্যাগণ স্নেহযত্নে বিপর্য্যস্ত তাহাকে করিয়া দেয়। হাসিয়া 'মেজ-বৌদিদিকে' বিজলী বলে, আমি কুটুম্ নয়?" তিনিও হাসিয়া বলেন, "কুটুমের বেশী তুমি ভাই—তোমাকে কৈ পাই?" বিজলীর গানে গল্পে পরিচিতার সংখ্যা তাহার বাড়িয়াই যায়। তাহাতেও বিজলীর রঙ্গ! সে ব'লে, "পাওনা গণ্ডা বাকি কিছু রেখে যাবোনা।" সে ক্ষেত্রে "দেনা" পরিশোধও সে করে। প্রতিশ্রুতি মত মেনোদাদাকে গান শুনাইতে সে ভুলে নাই।

শ্বশুরালয়ে কয়েকদিন অবস্থানের পরে জামাতৃষষ্ঠীর দিন সন্নিকটবর্ত্তী হইলে কন্যাজামাতাকে আনয়নের ব্যবস্থা বিজলীর জননী করেন। ষষ্ঠীর দিনে 'জামাই আনার' প্রথা বংশে না থাকায় তাহার পূর্ব্বেই জামাতা নিমন্ত্রিত হয়। কন্যা তাহার পূর্ব্বে আসে। আসিয়াই পিতাকে সে বলে, "এক সঙ্গে আমাদের একটা ফটোও নেই বাবা, তোলাতে

হবে।" কন্যা পুনরায় শ্বশুরালয়ে যাইবার পূর্ব্বে সেই প্রকারের একখানি আলোকচিত্র তোলান হয়। জনকজননীর মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সেই চিত্রে তাহার অবস্থান। চিত্র দেখিয়া আনন্দের তাহার সীমা থাকে নাই। জনকজননীর চিত্র-সম্বল দিন যে ঘনাইয়া আসিতেছে তাহারই আয়োজন কন্যা বুঝি করিয়া রাখে।

জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি বিজলী পিতাকে ব'লে, "আমায় নিয়ে চ'ল বাবা।" কন্যা যে একথা বলিবে পিতা আশা করেন নাই। তাহার কথায় সুতরাং তিনি চমকিত হ'ন। কালক্ষেপ না করিয়া কন্যা আনয়নের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহের পরেই বিজলী পিত্রালয়ে আগমন করে। স্থির থাকে একমাসকাল সে তথায় থাকিবে।

হিসাব নিকাশে

স্বগৃহে বধূ আনয়ন বা পিতৃগৃহে তাহাকে প্রেরণ সম্বন্ধে নিজ বাক্যের সম্মান রক্ষা বিজলীর শ্বশুর কখনই করিতে পারেন নাই। এই আষাঢ়েও বধূ প্রেরণ করেন তিনি নির্দ্ধারিত সময়ের ৪।৫ দিন পরে। বধূর আদর যে তিনি বা তাঁহারা করিতেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে সে আদর স্বার্থে না নিঃস্বার্থে? একমাত্র নন্দিনী বিজলী যে জনকজননীর প্রাণপুতলী আর সেও যে পিতৃমাতৃগতপ্রাণা তাহা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। পিতৃমাতৃবিচ্ছেদজনিত বেদনায় ব্যথিতা পুত্রবধূর মুখের দিকে চাহিয়াও তাহাকে 'আদর' করিবার লোভ তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারিতেন না। এ 'আদর' তাঁহাদের আত্মতৃপ্তির জন্য না 'আদর যাহাকে করিতেন তাহার তৃপ্তির জন্য? পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার জন্য কন্যার সাগ্রহ অনুরোধেই পিতার মনে এই সকল প্রশ্নের উদয়। তাহার মুখাবয়বে একটা কালিমার চিহ্ন দেখিয়া সংসয়-দোলায় দোদুল্যমান তিনি হ'ন। কন্যা সম্বন্ধে কয়েকদিন পূর্ব্বের একটা দুঃস্বপ্নে পিতা চিন্তান্বিতই হইয়াছিলেন। কন্যা আনয়নের সময়ে সেই দুঃস্বপ্নের কথা উল্লেখ তিনি করিলে 'আদরিণী' পুত্রবধূর আদরের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই বোধহয় স্বপ্নদর্শক 'দুর্ব্বলচিত্ত' বলিয়া আখ্যাত হয়। তিন কন্যার পিতা কিনা!

খেলা-শেষের পাঁচ দিন পূর্ব্বের—

" পথ দিয়ে কে যায় গো চ'লে
ডাক্ দিয়ে সে যায় "

Photo by Bimala Chandra Sarbadhikari.

অগ্রহায়ণের একবিংশতি দিবসে কন্যার বিবাহ হয়। সেই আষাঢ়ে পিতৃগৃহে আগমন করিবার পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে বিজলীকে বাস করিতে হয় প্রায় পাঁচমাস। বধূ-সমাদর যাহাকে বলে! পিত্রালয়ে আসিয়াও বিজলীর স্ফূর্ত্তি-হীনতা সকলেই লক্ষ্য করে। কন্যাকে একান্তে লইয়া গিয়া অনেক কথাই পিতা-পুত্রীতে হয়। সেই মহাপ্রাণ বালিকার স্মৃতির সম্মান রক্ষা হেতু সে সকল কথা এস্থলে প্রকাশিত হইল না। গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়া বিজলীর মানসিক স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়। কয়েক দিনের মধ্যেই বন্ধনহীন বিহঙ্গিনীর মত সে নাচিয়া বেড়ায়। সখীসম্মিলনে, সহোদরবর্গের সহিত রঙ্গ-কৌতুকে, গাল-গল্পে তাহার মত্ততার সীমা থাকে নাই। রাত্রি ১১ ঘটিকার পরেও তাহার মুক্ত-হাসির রোলে গৃহ মুখরিত হইত। হাসির তাহার আর বিরাম ছিল না। এমন হাসি বিজলী পূর্ব্বে কখনো হাসে নাই। হাসি-গল্প তাহার ফুরাইয়া আসিতেছিল বলিয়াই কি ঐরূপ হাসি সে হাসিত—কে জানে!

বিজলী একদিন পিতাকে বলে, "অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি, একে একে সব ঘুরে আসবো কেমন?" পিতা তাহাতে সম্মত হ'ন। কন্যাও তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়। নানাবেশে নানা অবস্থার আলোকচিত্র সহোদরবর্গেরদ্বারা তোলাইতে আগ্রহের সীমা তাহার থাকে নাই। যখন তাহার ইচ্ছা হইত আদরে সোহাগে জনকজননীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিত আবার তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সহোদরত্রয়ের নির্য্যাতনের পন্থা উদ্ভাবন করিতে বসিয়া যাইত। এত করিয়াও তাহার সাধ মিটিত না। ধীর, স্থির, সংযত বিজলীর অস্থিরতা, অধীরতার চিহ্নই দিন দিন দেখা যায়।

এই সময়ে একদিন বিজলীর জননী স্বপ্নে দেখেন যে তাঁহার গৃহাধিষ্ঠিত যুগল-মূর্ত্তির সিংহাসন অগ্নিসংযোগে প্রজ্জ্বলিত। উন্মাদিনীর ন্যায় অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে তিনি ছুটিয়া যান। যাইয়া দেখেন অগ্নি নির্ব্বাপিত কিন্তু সিংহাসন শূন্য! দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যথারীতি ব্রহ্মার পূজা দিয়াও ভয়-ভাবনায় অস্থির তিনি হ'ন। এই ব্যাপারের পূর্ব্বেই জামাতা-নিমন্ত্রণ হইয়া থাকায় তাহা বন্ধ করা হয় নাই। মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যেও জামাতৃ-সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হয়। নিমন্ত্রণানুসারে জামাতা

তাহার পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। সেদিন শনিবার ২০শে আষাঢ় ১৩৩৭। গল্প-গুজবে আহারাদি সম্পন্ন করিতে বিলম্বই হয়। গৃহপ্রত্যাগমনের পূর্ব্বে বৈবাহিক অনুরোধ করেন "কাল একবার বিজলী যাবে, পরশুই আসবে।" পরদিন সন্ধ্যাকালে বিজলীকে সঙ্গে করিয়া জামাতা লইয়া যায়। পিতার হাত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে কন্যা যানারোহন করে। ঠিক্ সেই সময়ে একটা পেচক কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে। চমকিত হইয়া পিতা কন্যার মুখেরদিকে চাহিয়া দেখেন কন্যার মুখ মসীবর্ণ!

বৈবাহিক প্রতিশ্রুতি-রক্ষা সেবারও করেন নাই। "পরশু" কন্যাকে আনিতে যাইয়া পিতা একাই ফিরিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া বলেন, "আবার ব'ললে পরশু।" গৃহিনী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবেই থাকেন কন্যার আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়াছিলেন। সে আশায় যাঁহারা তাঁহাকে নিরাশ করেন তাঁহারাও কন্যার পিতা মাতা!

শেষের দিনে

দিন যায় রাত্রি আসে আবার রাত্রির পর দিন ঘুরিয়া আসে কিন্তু যাহা যায় তাহা তো আর ফিরে না! দুনিয়ার দৌলতের বিনিময়েও তো তাহা হইবার নহে! আসে কেবল মনের পরতে পরতে জুড়িয়া বসিতে—স্মৃতির দহন। কী সে জ্বালা!

"বিজলীর আজ যাওয়া হ'লনা, পরশু আফিস্ যাবার সময় আমি পৌঁছে দিয়ে যাবো"—শুষ্ক হাসি হাসিয়া কুটুম্ব যখন সেই কথা বলে তাহার প্রতি বাক্য অগ্নিশলাকার ন্যায়ই পিতৃহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া জ্বালাইয়া পুড়াইয়া তাহা ক্ষার করিয়া দেয়। বিমূঢ়, স্তম্ভিত হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া নিজ কন্যাকে আকর্ষণ করতঃ কি বলিতে তিনি যাইতেছিলেন। বলিতে তাহা তিনি পারেন নাই—কন্যারই জন্য। "বিদ্যুদ্দাম সমপ্রভাং মৃগবতী স্কন্ধস্থিতাং"—সেই অন্যকালের মাতৃরূপিনী বিজলীর মতই প্রাণপ্রিয় তাঁহার নন্দিনীর স্থির দৃষ্টিতে নিরন্তই তাঁহাকে হইতে হয়। সেস্থানে তিলমাত্র আর

অপেক্ষা করিতে প্রাণ তাঁহার চাহে নাই। কন্যাকে সস্নেহে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলেন, "আসি মা।" অন্যদিনের মত গৃহ-দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পিতার সহিত নিম্নতলে সে অবতরণ করে। শ্বশুরও পিতাপুত্রীর অনুগমন করেন। বিদায়দানের পূর্ব্বে ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে সে ডাকে, 'বাবা'। কন্যার শিরশ্চুম্বন করিয়া ত্বরিৎ বিদায় গ্রহণ পিতা করেন। রাজপথে আসিয়া ফিরিয়া তিনি দেখেন কন্যা তখনও দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা—অপলক দৃষ্টিতে ব্যথাহত পিতার পানে চাহিয়া আছে। প্রাণ তাঁহার হাহাকারে তখন পূর্ণ। সেই প্রাণ লইয়াই উন্মাদের ন্যায় গৃহে তাঁহার প্রত্যাগমন। শয্যায় শয়ন করিয়াও দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা! দিন চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিবে না। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও মুছিল না কেন?

বিনিদ্র হইয়াই তিনি থাকেন—শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ! প্রহরের পর প্রহর এই ভাবে অতীত হইয়া রাত্রি যখন চারিঘটিকা মহাকাশ প্লাবিত করিয়া দিঙ্মণ্ডলে বিজলীর অপরূপ ছটা, অপরূপ করুণার জ্যোতি—মন তখন আপনা হইতেই চাহিল কোথায় সেই মহান কোথায় সেই মহোত্তম বিজলী যাঁহার মহিমা নির্দ্দেশ করিয়া দিল। আবার দেখিতে দেখিতে বিজলীই বা কোথায় মিশাইল, কেন মিশিল! লীলায়িত রঙ্গে আবার দেখা দিয়া বুঝাইয়া দিল না—"আমি অগ্নিবর্ণা বিজলী, আমি ওই নিয়মাধীন চন্দ্র নহি, সূর্য্য নহি, 'অরোরা বোরিয়ালিস্' নহি—আমি বিজলী মনোগতি, বজ্রপ্রসবিনী! সঙ্গে সঙ্গে অবিরল ধারে বৃষ্টি। ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জনে, দামিনীর পলক-ঝলকে স্থিরা প্রকৃতি মুহূর্ত্তে যেন প্রলয়ঙ্করী! অনিদ্র, পরিশ্রান্ত ব্যথিত পিতার প্রাণে স্মৃতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অতীতের আর এক প্রলয়ঙ্করী চিত্র সমুজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। রবি-করোজ্জ্বল দিন-শেষে অসীম নীলাকাশ ধূসরবর্ণ, নীলজল কালোয়-কালো। যাত্রীপূর্ণতরণী প্রবল প্রভঞ্জনের আঘাতে বিপর্য্যস্ত। আকাশে বাতাসে সাগরের জলে ভীষণ হুঙ্কার! ধীরে ধীরে পট পরিবর্ত্তন—প্রভঞ্জনের প্রলয়ঙ্করী গতি সংযত। মৃদু পবন হিল্লোলে প্রকৃতি লীলায়িত—চন্দ্র কিরণে উদ্ভাসিত। চন্দ্রমাশালিনী সেই যামিনীতেই বিজলীর আবির্ভাব! আর আজ? প্রলয়কালীন এই

হুঙ্কারের মাঝে কোথায় তাঁহাদের প্রাণপুতলী—দেবতার দান সেই বিজলী। সেতো মাতৃক্রোড়ে নাই সে যে পতিগৃহে! পিতৃ দত্ত, মাতৃ দত্ত, মাতামহ দত্ত, আত্মীয়বন্ধুবান্ধব দত্ত মহার্ঘ বসন মহামূল্য ভূষণ থরে থরে সোনারঅঙ্গে তাহার সাজাইয়া দিয়া তাঁহারাই যে তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন! ভিক্ষালব্ধ অমূল্যরত্ন আপন হাতে যে তাঁহারা বিলাইয়া দিয়াছেন। ভাবনা এখন করিলে কি হইবে?

ভাবনা কিন্তু বাড়িয়াই যায়। প্রভাত সমাগমেও বৃষ্টির বিরাম ছিল না। বেলা তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত সেই একই অবস্থা—মনের এবং প্রকৃতির। তিন ঘটিকা হইতে বৃষ্টির বেগ হ্রাস পায় বটে কিন্তু প্রকৃতির একটা স্তব্ধতায় বিজলীর বিষাদিত জনকজননীর মানসিক অসচ্ছন্দতার বৃদ্ধিই হয়। ঘরে স্থির হইয়া থাকিতে কিছুতেই তাঁহারা পারেন নাই। "ঘর বার" করিয়া তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন।

সন্ধ্যা সমাগমে যখন বিজলীর কলকণ্ঠে দিক্ মুখরিত হইত ঠিক্ সেই সময়ে প্রভাস সংবাদ দেয় যে, কে 'ফোন্' করিয়াছে—বিজলী "পড়িয়া গিয়াছে"। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র হতভাগ্য জনকজননী উন্মত্তপ্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে বিজলীর কাছে ছুটিয়া যান। কুটুম্বগৃহে উপস্থিত হইবামাত্র "বাবা বাবা মা মা" কন্যার সকরুণ আহ্বান তাঁহারা শুনিতে পা'ন। হৃতচৈতন্যপ্রায়, অর্দ্ধস্খলিত-বসন জনকজননী সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করিয়া দেখেন যে নিম্নতলের এক পরিত্যক্তকক্ষে সোনার বিজলী অঙ্গারবরণ হইয়া পড়িয়া আছে। কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র কন্যা বলে, "বাবা এসেছো, মা এসেছো, কতক্ষণ যে ডাকৃছি তোমাদের, দেখো তোমাদের সোনার বিজলী কি হয়েছে—আমি পুড়ে গেছি।" সে কথায় শ্বশুর চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, শাশুড়ী বিনাইলেন, পতিদায়াদবর্গ সান্ত্বনা দিলেন কিন্তু বিজলীর পিতা মাতা নির্ব্বাকনেত্রে শুধু চাহিয়াই রহিলেন। পরে সকলকে নীরব হইতে বলিয়া কন্যার শিয়রদেশে জননী নিজের স্থান করিয়া লইলে, কন্যার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পিতা ছুটাছুটী করিয়া বেড়ান। ফলে বিজলীর মাতামহ, ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার মনীন্দ্রনাথ বসু এবং আরও অনেকে এক ঘণ্টার মধ্যে ঔষধ পত্র 'নার্শ' প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করেন। তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে

ও পরে পিতা কন্যার পার্শ্বেই থাকেন। পরিপূর্ণ বিজলীর জ্ঞান—তদবস্থায়ও। দিক্‌পালগণের ক্ষেত্রে যে তাহার উদ্ভব তখনও সে সেকথা ভুলে নাই। তাহার একটি ইঙ্গিতে শ্বশুর কুলের ভবিষ্যত যে নির্ভর করে তাহাও তাহার স্মরণে ছিল। দাহ-জনিত অবর্ণনীয় যন্ত্রনা অবলীলাক্রমে শাসন করতঃ সে তখনও তাহার শেষ কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সীতা-সাবিত্রীর পদাঙ্কানুসারিণী যে সে!

জনকজননীকে সে বলে, "তোমাদের একটা মেয়ে বড় কষ্ট হবে না?" কখনও খোঁজ করে, "ভায়েরা কৈ, মামীমারা কৈ, দাদা কৈ—দেখবো যে তাদের।" কখনও অভিযোগ, "এরা আমায় লেমনেড্ বরফ খেতে দিচ্চে না বাবা।" "দাদা" আসিলে তাঁহার সঙ্গে কথা, ভায়েদের কাছে ডাকিয়া সম্ভাষণ, মৃগেন বাবুকে চিকিৎসার কথা বলা, কত কি! এক একবার কী কাতরতা—"কি হবে তোমাদের মা।"

চিকিৎসা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ প্রয়োগে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলা হয়। তাহার অচৈতন্য অবস্থায় তড়িৎ-দীপ-রাজিতে তাহাকে আবরিত চিকিৎসকেরা করিয়া রাখেন। নভোমণ্ডলে বিদ্যুল্লতার হাসাহাসি ঢলাঢলি তখন দেখে কে! বারিদবরণ কাহার মিনতিতে কে জানে, বিন্দু বিন্দু বারির মালা গাঁথিয়া কাহার জন্ম প্রীতি- উপহার দিতেছিলেন।

মানুষের সব বিদ্যা সব উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়। জ্ঞান বিজলীর আর হয় নাই। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকার সময় দেববালার দেহাত্মা ভগবদ্‌-পদে বিলীন হয়। শেষ মুহূর্ত্তেও বাবা' বলিয়া চিৎকার, অজ্ঞান অবস্থাতেই সে করিয়া উঠিয়াছিল। চিৎকার করিয়া 'বাবা' তাহার উত্তর দেয়। জননী মর্ম্মন্তুদ ক্রোন্দনে ভূমিতে লুটাইয়া পড়েন। সহোদরবর্গ নির্ব্বাক নিস্পন্দ!

বিজলী চলিয়া গেল, থাকিল না—থাকা হৈল না! আর কি আসিবেনা মা! হরি ওঁ।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের শেষ কথা

ভাগ্যদোষে আজ আমি কন্যা-হারা—শোকে চিন্তায় জরাজীর্ণ। কন্যাগর্ব্বে বোধ হয় আত্মহারা হইয়া আমি পড়িয়াছিলাম। দর্পহারী আমার সে দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। দর্পহারীর দর্প চূর্ণ করিতে কি কেহ নাই। হতভাগ্য পিতার বুকফাটা অশ্রুজল কি বৃথায় যাইবে! সকলেই কি নীরবে সহ্য করিবে? কোথায় গো ব্যথার ব্যথী এসো আর নীরবে থাকিও না। বাজাও বাজাও তোমার পূন্য শঙ্খ! তেমনি করিয়া বাজাও দেখি তোমাদের বিজলী যেমন করিয়া বাজাইত! সেই পরিচিত ইঙ্গিতে এই মৃতপ্রায় প্রাণে সাড়া পড়ে কিনা দে'খি দেখি। যদি পার তাহা হইলেই দর্পহারীর দর্প তোমরাই চূর্ণ করিতে পারিবে। বিজলী সে তখন শত সহস্র মূর্ত্তিতে তাহার বড় তাপিত পিতামাতার প্রাণ স্নিগ্ধ করিয়া দিবে। এসো মা সব বাঙলার মেয়ে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন তোমরা আমায় বিজলী-হারা হইতে দিও না। জীবনের সায়াহ্নে তোমাদের নিকট এই একটী মাত্র নিবেদন—ভিক্ষা। ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাঁও, দানের পূণ্য তোমাদের নিশ্চয়ই হইবে!

বিজলী প্রয়াণে *

রূপকথা পড়ে মনে
মাত্র ক'মাস আগেকার কথা না জানি কি এক ক্ষণে
তড়িত রেখা সে বিজলী ভাসিয়া "কিরণ" শরীরাকাশে
দেখাল দীপ্ত মাধুরী ভুবনে সেই কথা মনে আসে।
আট মাস আগে দেখেছি তাহারে মুক্ত পাখীর মত
বন্ধন হীন সরল গতিতে গান গেয়ে যেত কত।
জামতাড়া নামে পাহাড় প্রদেশে কত বন বিহগিনী
চিনেছে তাহারে কণ্ঠেরস্বরে তাকে আপনার জানি।
সহসা সে পাখী কি এক খেয়ালে আপনার মনে হেসে
"কিরণের" হাতে নিবিড় বাঁধনে ধরা দিয়াছিল এসে
আটমাস আগে অগ্রহায়ণে কত গান কত হাসি
কত উৎসব কত আনন্দ এনেছিল রাশি রাশি!
আটমাস পরে আজ
ঘোর ঘন ঘোর—আষাঢ়ে সাজিল অতি নিদারুণ সাজ
অগ্নি প্রতিমা স্বাহার মত জ্বল জ্বল জ্বল রূপে
দাঁড়ায়ে কহিল, "খেলা শেষ মোর পৃথিবী অন্ধকূপে।"
বিজলী গতিতে বিজলী লতিকা ধরা হ'তে গেল চলে
ঝর ঝর ঝর কাঁদিল প্রকৃতি বক্ষ ভাসিল জলে!
বুকফাটা রবে ডেকে ওঠে পিতা সে কথা না শুনে কানে
মুক্ত পাখী সে উড়ে চলে গেল মহাকাল আহ্বানে
মরু ঝটিকার দুর্ব্বার বেগে বিজলী অগ্নিশিখা
মহা যাত্রায় যাত্রী আজিকে মমতার সাগরিকা।

---

* গ্রন্থকীরের ভ্রাতুষ্পুত্র মনুজচন্দ্র বিরচিত।

বার্ত্তা শুনিল লোকে
চকিত বিস্ময়ে কথা নাহি কয়,—মর্ম্মন্তুদ শোকে
মূর্চ্ছিতা মাতা সে যাতনার কথা ব্যক্ত হবার নহে
তিনটি ভ্রাতার মরম বেদনা অশ্রুধারায় বহে,
রূপকথা পড়ে মনে
সেই হাসি গান অন্তরের মাঝে ধ্বনিছে ক্ষণে ক্ষণে
ঘোর ঘন ঘটা,—আকাশেতে আজ একটি তারকা নাই,
স্তব্ধ প্রকৃতি বিন্দু বিন্দু অশ্রু ফেলিছে—তাই
আকাশ বাতাস গেয়ে যায় আজ জীবনের শেষ গাথ।
রাজপথে চলে শব বাহকেরা কারু মুখে নাই কথা
মহাকাশ থমথমে
নিথর নিশীথে বিরাট বেদনা বক্ষে উঠিছে জমে
পথ জনহীন শব বাহকেরা চলিতেছে ধীরে ধীরে
অস্ফুটে কভু হরি হরিবোল শোনায় যাত্রীটিরে
পাথেয় নিয়াছে পারের যাত্রী হরি হরিবোল ধ্বনি
আর আছে ভালে সিঁন্দুর লেখা হাতে রাঙ্গা ডোরখানি
রূপকথা পড়ে মনে
প্রহরেকতুই আগেকার রূপ ভেসে ওঠে দুনয়নে
সত্য সে নাকি সুষমার ছবি এই কথা বলে সবে
এ সত্য যদি গো হয় স্বপন, মানুষের বুকে তবে
ওহে ভগবান দিওনাক তুমি ভালবাসা প্রেম স্নেহ
দয়াময় নামে সেহেতু তোমায় আর ডাকিবেনা কেহ।
জানি ভগবান খেলা শেষে তুমি ঈষৎ হাসিয়া বল
"ওরে জীব তোরি শাস্তির তরে করিলাম এত ছল"

ওহে মঙ্গল বিশ্ববিধাতা শাস্তি এ যদি হয়
মানুষেরা তবে শান্তির নামে চির দিন পাবে ভয়
মহা শ্মশানের বুকে
যেথায় তাহার তনুলতা-পড়ে সেথায় স্বরগ থেকে
দেবতার দূত"এসে যতনে চিতা হতে তারে তোলে
ধূ! ধূ! ধূ! চিতার মাঝারে কায়া মায়া গেল জ্বলে।
মিশে গেল বালা ভাগিরথী কূলে, নৈশ অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে সেখানে মনে হল মোর—"সীমাহীন ঐ পারে
বৈতরণীর অগ্নিলহরে তরী তার ভেসে চলে,"
সহসা নিভিল চিতার আগুন পূত জাহ্নবী জলে।
জীবন নাট্যে হল শেষাঙ্ক পড়ে গেল যবনিকা
কিছু নাই আর আছে মাত্র তার স্মৃতি আগুনের শিখা !
তখন আমার বিষাদ রুদ্ধ কণ্ঠে ফুটিল বাণী
"হে মহাযাত্রী জীবনে তোমায় দেওয়া হয় নাই জানি
আশীষের ফুল দূর্ব্বা ধান্য, আজ মরণের পর
মোর নয়নের একফোঁটা জল ধর ধর চিতা'পর।
শাস্তি দানিতে অথবা পাইতে এই শেষ সম্বল
শান্তি ! শান্তি ! হউক তোমার আত্মার মঙ্গল।"